গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা

জেলা তথ্য ঃ ঝালকাঠী

আবু মোস্তফা কামাল উদ্দিন
এবং
এ.বি.এম. সিদ্দিকুর রহমান

জানুয়ারি, ২০০৫

প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অফিস
সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্প

জেলা তথ্য :
ঝালকাঠী

প্রকাশকাল :
জানুয়ারি, ২০০৫

প্রকাশনায় :
পিডিও-আইসিজেডএমপি
সায়মন সেন্টার (৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা)
বাড়ি : ৪ এ, রোড : ২২
গুলশান ১, ঢাকা ১২১২
ফোন : (৮৮০-২) ৮৮২৬৬১৪, ৯৮৯২৭৮৭
ফ্যাক্স : (৮৮০-২) ৮৮২৬৬১৪
ই-মেইল : pdo@iczmpbd.org
ওয়েব সাইট : www.iczmpbangladesh.org
ও
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)
বাড়ি : ১০৩, রোড : ০১
বনানী, ঢাকা ১২১৩।

প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অফিস - সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (পিডিও-আইসিজেডএমপি) বাংলাদেশ, নেদারল্যান্ড ও যুক্তরাজ্য সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত একটি বহুখাতভিত্তিক এবং বহুপ্রতিষ্ঠানভিত্তিক উদ্যোগ, যেখানে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হচ্ছে মূল মন্ত্রণালয় এবং পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) মূল সংস্থা।

মুদ্রন সহযোগিতায় :

ISBN :

তথ্যের প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে জনগণের ক্ষমতায়নের একটি প্রয়াস
জেলা তথ্য : ঝালকাঠী

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি অন্য অঞ্চল থেকে স্বতন্ত্র। একদিকে প্রকৃতির অপার সম্পদ অন্যদিকে প্রকৃতির বিরূপতার প্রতি লক্ষ্য রেখেই এ অঞ্চলের ১৯টি জেলার উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। এ লক্ষ্যে পিডিও-আইসিজেডএমপি প্রকল্প একটি নীতিমালার খসড়া প্রস্তুত ও কর্মকৌশল নির্ধারণ করেছে। কর্মকৌশলগুলোর ভিত্তিতে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। উন্নয়ন কার্যক্রমে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ কার্যকরি করতে উপকূলীয় অঞ্চলের ১৯টি জেলার প্রতিটির জন্য একটি করে তথ্য বই লেখা হয়েছে যাতে করে জেলার জনগণ স্ব-স্ব জেলার উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখতে পারবে।

আবু মোস্তফা কামাল উদ্দিন এবং এ.বি.এম. সিদ্দিকুর রহমান যৌথভাবে এই বইটি লিখেছেন। অন্যান্য যারা এই বই লিখতে বিভিন্ন সময়ে সহযোগিতা করেছেন তারা হলেন মহিউদ্দিন আহমদ, ড. মোঃ লিয়াকত আলী ও মুহাম্মদ শওকত ওসমান। অক্ষর বিন্যাস ও লে- আউটে সহযোগিতা করেছেন মোঃ নুরুজ্জামান মিয়া।

বইটির পর্যালোচনাসহ মতামত দিয়েছেন পিডিও ও ওয়ারপো-র বিশেষজ্ঞ বৃন্দ। এ ছাড়া ঝালকাঠী জেলার বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ মতামত দিয়ে বইটিকে সমৃদ্ধ করেছেন।

ড. এম. রফিকুল ইসলাম বইটি লিখতে সার্বিক পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা দিয়েছেন।

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জেলাভিত্তিক। ঐতিহ্যগতভাবেই মানুষের জেলাভিত্তিক পরিচয় আছে। অপরদিকে জেলাগুলোরও সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রও জেলা। অন্যদিকে উপকূলীয় জীবনমানের উন্নয়নের জন্য জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার নীতিগত সিদ্ধান্ত উপকূলীয় অঞ্চলের নীতিমালায় রয়েছে।

সমন্বিত উপকূল অঞ্চল ব্যবস্থাপনার মূল নীতি হল জনগণের অংশগ্রহণে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। উপকূলীয় অঞ্চল উন্নয়নে জেলাভিত্তিক উদ্যোগকে কার্যকর করতে প্রয়োজন জেলার জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ। তাই, জেলার জনগণকে তাদের নিজ নিজ জেলার অবস্থা, অবস্থান, প্রাকৃতিক সম্পদ, সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে অবহিত করার জন্য জেলাভিত্তিক এ বই লেখা হয়েছে। উপকূলীয় ১৯টি জেলার জন্য আলাদা আলাদা বই লেখা ও প্রচার করা হচ্ছে।

এ বইটি লেখা হয়েছে ঝালকাঠী জেলার জনগণকে উন্নয়ন কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট করার জন্য। এতে রয়েছে জেলার প্রাকৃতিক সম্পদ, কৃষি সম্পদ, বনজ ও ফলজ সম্পদ এবং মানব সম্পদের বর্ণনা এবং ভবিষ্যতে এ সম্পদের অবস্থা কি হতে পারে সেই বর্ণনা।

এ বই-এর প্রধান অংশগুলো হচ্ছে 'সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা' এবং 'সম্ভাবনা ও সুযোগ'-এর উপর বিশদ বর্ণনা। এ বর্ণনার তথ্য ভিত্তিক বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হয়েছে অন্যান্য অংশে। তাই জেলার সমস্যা ও সম্ভাবনাগুলো জেনে নিয়ে উন্নয়ন পরিকল্পনায় আগ্রহ সৃষ্টি ও অবদান রাখতে এ বই জনগণ তথা উন্নয়ন অংশীদারদের সাহায্য করবে।

তা ছাড়াও 'উপকূলীয় উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ' আলোচনা এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহায়ক আলোচনায় এই বই সহায়তা করবে।

এ বইয়ের জন্য তথ্য নেয়া হয়েছে প্রধানত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বা. প. ব্যু.)- এর বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে। এর পরেই সবচেয়ে বেশি তথ্য এসেছে প্রকল্পের বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে। এ ছাড়াও পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ আবহাওয়া পরিদপ্তর থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে।

সাহায্য নেয়া হয়েছে ঝালকাঠীর উপর লিখিত বিভিন্ন বই থেকে -

১। আহমেদ, সিরাজউদ্দীন, ১৯৮২। বরিশাল বিভাগের ইতিহাস। ভাস্কর প্রকাশনী, বরিশাল-ঢাকা। ঢাকা, জুলাই, ২০০৩।

২। বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, ২০০২। সংকলন । বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, ঝালকাঠী জেলা শাখা। ঝালকাঠী, নভেম্বর ২০০২।

৩। বিবিএস, ২০০১। কৃষি শুমারী ১৯৯৬: জেলা সিরিজ ঝালকাঠী। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। ঢাকা, সেপ্টেবর, ২০০১।

৪। ওয়াজেদ, আবদুল, ২০০২। বাংলাদেশের নদীমালা। পালক পাবলিশার্স। ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০০২।

৫। PDO-ICZMP, 2001, Inventory of Coastal & Estuarine Island & Char lands (Draft Report), Program Development Office for Intergrated Coastal Zone Management Plan Project; Bangladesh, Dhaka, August 2001

৬। CEGIS, 2004, Vulnerability Analysis of Major Livelihood Groups in the Coastal Zone of Bangladesh. Final Report. Centre for Environmental and Geographic Information Services, Dhaka, May 2004.

৭। MD. HABIBUR RASHID, 1980, Bangladesh District Gajetteers Bakerganj, Establishment, Division, Government of the People's Republic of Bangladesh. Dhaka, December 1980.

এ ছাড়াও বইটির বিশেষ পর্যালোচনা ও মূল্যবান তথ্য ও মতামত দিয়েছেন :

- মোঃ হেমায়েত উদ্দীন হিমু, সাধারণ সম্পাদক, ঝালকাঠি প্রেসক্লাব, ঝালকাঠি।

সূচীপত্র

মুখবন্ধ
জেলা মানচিত্র

সূচনা **১-৪**
এক নজরে ঝালকাঠী ২
জেলার অবস্থান ৩
উপজেলা তথ্য সারণী ৪

প্রকৃতি ও পরিবেশ **৫-১১**
প্রাকৃতিক পরিবেশ ৫
কৃষি সম্পদ ৮
মৎস্য সম্পদ ৯
দুর্যোগ ১০

জীবন ও জীবিকা **১৩-১৫**
জনসংখ্যা ১৩
জনস্বাস্থ্য ১৩
শিক্ষা ১৪
সামাজিক উন্নয়ন ১৪
প্রধান জীবিকা দল ১৪
অর্থনৈতিক অবস্থা ১৫

নারীদের অবস্থান **১৭-১৮**

অবকাঠামো **১৯-২১**
রাস্তা-ঘাট ১৯
নৌ-পথ ১৯
হাট-বাজার ও বন্দর ১৯
বিদ্যুৎ/টেলিযোগাযোগ ১৯
ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র ২০
শিল্পাঞ্চল ২০
সেচ ও গুদাম ২০
উন্নয়ন প্রকল্প **২০**

সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা **২৩-২৫**
পরিবেশগত **সমস্যা** ২৩
আর্থ-সামাজিক সমস্যা ২৩
শিল্প বিষয়ক সমস্যা ২৪

সম্ভাবনা ও সুযোগ **২৭-২৯**
কৃষি ও অর্থনীতি ২৭
শিল্প ২৮
প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ২৯

ভবিষ্যতের রূপরেখা **৩১**

দর্শনীয় স্থান ও খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব **৩৩-৩৪**

জেলা মানচিত্র

JHALOKATI DISTRICT
2 0 2 4 km
90°10'
90°20'
22° 45'
BARISAL
PIROJPUR
Nalchiti R
Kalijira R
22° 40' N
JHALOKATI
Launch Ghat
Gajalia R.
Nalchity
Chandantalar K
Khairabad R
22° 35'
Rajapur
Sailkati R
Bishkhali R.
22° 30'
BARISAL
PIROJPUR
BANGLADESH
22° 25'
Kanthalia
Amua Don
BARGUNA
Bishkhali R
Bay of Bengal
22° 20'
90°05'
90°15'
District Boundary
Upazila Boundary
District Head Quarter
Upazila/Thana/Head Quarter
Launch Ghat
Regional Highway
Feeder Road
Waterbody
River
N
W
E
S
সূত্র : বাংলা পিডিয়া, ২০০৩

সূচনা

বিস্তীর্ণ সবুজ মাঠ, গাছ-গাছালি, নদী-নালা নিয়ে অপার সৌন্দর্য্যমণ্ডিত ছোট্ট একটি জেলা ঝালকাঠী। বহু সুখ-দুঃখ আর গৌরবের ইতিহাস এই ঝালকাঠী। কেননা, পর্তুগীজদের লুণ্ঠন, হত্যাযজ্ঞ, বৃটিশদের অত্যাচার আর পাকবাহিনীর হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের গৌরবময় ইতিহাস বহন করছে ঝালকাঠী। একদিকে মানুষের স্বাধীনচেতা মনোভাব, নিজস্ব সংস্কৃতির উজ্জ্বল ইতিহাস এবং অন্যদিকে ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রবিন্দু এবং প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে ঝালকাঠী জেলা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

বাংলাদেশের প্রধান নদী পদ্মা, মেঘনা ও আড়িয়াল খাঁর কয়েকটি শাখা নদী এ জেলার উপর দিয়ে বয়ে গেছে। ঝালকাঠী জেলা পদ্মা ও মেঘনার পলল ভূমি দ্বারা সৃষ্ট। এ জেলার নদী-খালে বেশির ভাগই মিঠা পানির প্রবাহ এবং রয়েছে প্রাকৃতিক জোয়ার-ভাটা।

১৯৭১ সালের ১লা জুলাই'র পূর্ব পর্যন্ত ঝালকাঠী বরিশাল জেলার অন্তর্গত একটি থানা ছিল এবং ঐ তারিখ থেকেই ঝালকাঠী মহকুমায় রূপান্তরিত হলেও মহকুমার কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৭২-এ। ঝালকাঠী জেলার মর্যাদা লাভ করে ১৯৮৪ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি। জেলার উত্তরে বরিশাল, দক্ষিণে বরগুনা এবং পূর্বে বরিশাল ও পশ্চিমে পিরোজপুর জেলা অবস্থিত।

এ জেলার নাম ঝালকাঠী হবার পিছনে একটি প্রতিষ্ঠিত এবং বিশ্বাসযোগ্য জনশ্রুতি রয়েছে। এ অঞ্চলে মানুষ কবে থেকে বসবাস শুরু করেছে তার সঠিক কোন তথ্য নাই। এ নিয়ে নানা জনের নানা মত রয়েছে। ঐতিহাসিক ও বাকেরগঞ্জ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বেভারেজ লিখেছেন, এ জেলার প্রায় সমগ্র দক্ষিণ অংশ সুগন্ধা বা সন্ধা নদীর চর দিয়ে গড়া। এক সময় সুগন্ধা বা সন্ধা নদীর দক্ষিণ তীরে ছিল বর্তমান ঝালকাঠীর পোনাবালিয়া এবং উত্তরপাড়ে ছিল বর্তমান উজিরপুর। মাঝের এ বিস্তীর্ণ অঞ্চল পুরোটাই ছিল নদী। এ নদীর চরে প্রাকৃতিক নিয়মে সৃষ্টি হয়েছিল গভীর জঙ্গল। আর তা ছিল সুন্দরবনেরই অংশ। নদীতে ভেসে ভেসে মাছ ধরতে গিয়ে মানুষ জীবনের প্রয়োজনে জঙ্গল কেটে তৈরি করে আবাসভূমি আর ফসলের মাঠ। ঐ সময় সুগন্ধা নদীর দক্ষিণ পাড়ে একই গ্রামে বসবাস করত একদল কৈবর্ত জেলে। এক সময় গ্রামবাসীদের সাথে জেলেদের সংঘর্ষ বাঁধে। এর পর জেলেরা ঐ এলাকা ছেড়ে বর্তমান ঝালকাঠীর বাসণ্ডা খালের (ধানহাটা খাল) পশ্চিম তীরে কাটাবাখারী জঙ্গল কেটে আবাদ করে এবং বসতি স্থাপন করে। সেই থেকে এ স্থানের নাম হয় জেলেকাঠী। সময় আর ভাষার বিবর্তনের ফলে বর্তমান নাম ঝালকাঠী। ১৮৪৫ সালে সেই ঝালকাঠীতে থানার আদি ও প্রথম কর্মকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। এর পর ঝালকাঠী থানা কর্মকেন্দ্র মহারাজগঞ্জে অর্থাৎ বর্তমান ঝালকাঠীতে স্থানান্তরিত হয়।

ঝালকাঠী জেলার আয়তন ৭৪৯ বর্গ কিলোমিটার, যা সমগ্র বাংলাদেশের আয়তনের ০.৫১%। এলাকার বিচারে এটি উপকূলীয় ১৯টি জেলার মধ্যে আয়তনে ১৯তম স্থানে ও বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ৬২ তম স্থানে এবং বরিশাল বিভাগের ৬টি জেলার মধ্যে ৬ষ্ঠ স্থানে রয়েছে। ৪টি উপজেলা, ২টি পৌরসভা, ৩২টি ইউনিয়ন, ৪৫১টি গ্রাম, ১৮টি ওয়ার্ড নিয়ে ঝালকাঠী জেলা। ঝালকাঠী সদর, নলসিটি, রাজাপুর আর কাঠালীয়া জেলার ৪টি উপজেলা।

উপজেলা	**৪**
পৌরসভা	**২**
ইউনিয়ন	**৩২**
ওয়ার্ড	**১৮**
গ্রাম	**৪৫১**

উল্লেখ্য, বাংলাদেশে উপকূলীয় অঞ্চলের ভূমিভিত্তিক সীমা নির্ধারণের জন্য তিনটি সূচক বিবেচনা করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে জোয়ার-ভাটার প্রভাব, লোনা পানির অনুপ্রবেশ এবং ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছ্বাস। এর ভিত্তিতে ঝালকাঠী জেলার ৪টি উপজেলাই অন্তর্বর্তী উপকূলীয় (Interior Coast) এলাকায় পড়েছে।

এক নজরে ঝালকাঠী

	বিষয়	একক	ঝালকাঠী	উপকূলীয় অঞ্চল	বাংলাদেশ	তথ্য সূত্র ও বছর
এলাকা/ প্রশাসনিক	এলাকা	বর্গ কি.মি.	৭৪৯	৪৭,২০১	১৪৭,৫৭০	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	উপজেলা	সংখ্যা	৪	১৪৭	৫০৭	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	ইউনিয়ন	সংখ্যা	৩২	১৩৫১	৪৪৮৪	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	পৌরসভা	সংখ্যা	২	৭০	২২৩	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	ওয়ার্ড	সংখ্যা	১৮	৭৪৩	২৪০৪	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	মৌজা / মহল্লা	সংখ্যা	৪৮৯	১৪৬৩৬	৬৭০৯৫	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	গ্রাম	সংখ্যা	৪৫১	১৭৬১৮	৮৭৯২৮	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
জনসংখ্যা	মোট জনসংখ্যা	লাখ	৬.৯২	৩৫০.৭৮	১২৩৮.৫১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	পুরুষ	লাখ	৩.৪৪	১৭৯.৪২	৬৩৮.৯৫	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নারী	লাখ	৩.৪৮	১৭১.৩৫	৫৯৯.৫৬	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	জনসংখ্যার ঘনত্ব	বর্গ কি.মি.	৯২৫	৭৪৩	৮৩৯	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	লিঙ্গ অনুপাত	অনুপাত	৯৯	১০৪.৭	১০৬.৬	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	গৃহস্থালির আকার	গৃহ প্রতি জনসংখ্যা	৪.৮	৫.১	৪.৯	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	গৃহস্থালির মোট সংখ্যা	লাখ	১.৪৬	৬৮.৪৯	২৫৩.০৭	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নারী প্রধান গৃহ	গ্রামীণ গৃহস্থের (%)	৪.৭৭	৩.৪৪	৩.৫	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
ভৌত অবকাঠামো	টেকসই দেয়ালসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৬৫	৪৭	৪২	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
	টেকসই ছাদসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৬২	৫০	৫৪	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
	বিদ্যুৎ সংযোগসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	২২	৩১	৩১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	প্রাথমিক স্কুল	সংখ্যা / ১০,০০০ জন	৯.২	৭	৬	২০০১(প্রা.শি.অ, ২০০৩)
	রাস্তার ঘনত্ব	কি.মি./বর্গ কি.মি.	১.০১	০.৭৬	০.৭২	বিশ্ব ব্যাংক, ১৯৯৬ ও বি.বি.এস.,২০০৩
	বাজারের ঘনত্ব	বর্গ কি.মি. / সংখ্যা	৫৪	৮০	৭০	১৯৯৬ (বিশ্ব ব্যাংক, ১৯৯৬)
অর্থনীতি	মোট আয়	কোটি টাকা	১,০২৬	৬৭,৮৮০	২,৩৭,০৭৪	১৯৯৯/২০০০(বি.বি.এস.,২০০২)
	মাথাপিছু আয়	টাকা	১২৮৮৩	১৮,১৯৮	১৮,২৬৯	১৯৯৯/২০০০(বি.বি.এস.,২০০২)
	কর্মক্ষম শ্রম শক্তি (১৫ বছর+)	হাজার	৬১৮	১৭,৪১৮	৫৩,৫১৪	১৯৯৯/২০০০(বি.বি.এস.,২০০২)
	কর্মরত নারী (খাদ্য বা অর্থের বিনিময়ে)	% (১৫-৪৯ বয়সদল)	২৪.৫	২৬	২৮	২০০১ (নির্পোট, ২০০৩)
	কৃষি শ্রমিক	গ্রামীণ গৃহস্থের (%)	২৬	৩৩	৩৬	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
	জেলে	গ্রামীণ গৃহস্থের (%)	২৬	১৪	৮	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
	মাথাপিছু কৃষি জমির পরিমাণ	হেক্টর	০.০৯	০.০৬	০.০৭	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
	দারিদ্র	মোট গৃহস্থের (%)	৩৮.৩	৫২	৪৯	১৯৯৮(বি.বি.এস.,২০০২)
	অতি দারিদ্র	মোট গৃহস্থের (%)	১৮.২	২৪	২৩	১৯৯৮(বি.বি.এস.,২০০২)
শিক্ষা	প্রাথমিক স্কুলে ভর্তির হার	৬-১০ বছর শিশু(%)	১০০	৯৫	৯৭	২০০১(প্রা.শি.অ, ২০০৩)
	সাক্ষরতার হার (৭ বছর+)	মোট জনসংখ্যা (%)	৬৬	৫১	৪৫	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	পুরুষ	%	৬৭	৫৪	৫০	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নারী	%	৬৫	৪৭	৪১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	সাক্ষরতার হার (১৫ বছর+)	মোট জনসংখ্যা (%)	৭০	৫৭	৪৭	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	পুরুষ	%	৭৩	৬১	৫৪	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নারী	%	৬৭	৪৯	৪১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
স্বাস্থ্য	গ্রামীণ পানি সরবরাহ (সক্রিয় টিউবওয়েল)	প্রতি গড় জনসংখ্যা	৭১	১১১	১১৫	২০০২ (ডি.পি.এইচ.ই., ২০০৩)
	কল অথবা নলকূপের পানির সুবিধাপ্রাপ্ত ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৮৪	৮৮	৯১	২০০১(বি.বি.এস., ২০০৩)
	স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার সুবিধাপ্রাপ্ত ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৫৯	৪৬	৩৭	২০০১(বি.বি.এস., ২০০৩)
	হাসপাতালে শয্যাপ্রতি জনসংখ্যা (সরকারি)	জন/শয্যা	৩,৮৮২	৪,৬৩৭	৪,২৭৬	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নবজাতক মৃত্যুর হার	প্রতি হাজারে	৫২	৫১-৬৮	৪৩	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	<৫ বছর শিশু মৃত্যুর হার	প্রতি হাজারে	৮৭	৮০-১০৩	৯০	২০০০ (বি.বি.এস. ও ইউনিসেফ, ২০০১)
	অতি অপুষ্টির হার	%	৮	৬	৬	২০০০ (বি.বি.এস. ও ইউনিসেফ, ২০০১)
	ছেলে	%	৫	৪	৪	২০০০ (বি.বি.এস. ও ইউনিসেফ, ২০০১)
	মেয়ে	%	১১	৮	৬	২০০০ (বি.বি.এস. ও ইউনিসেফ, ২০০১)
	মাতৃ মৃত্যুর হার	প্রতি হাজারে	৬	৫	৫	১৯৯৮/৯৯ (স্বাস্থসেবা অধিদপ্তর, ২০০০)
	আধুনিক জন্মনিয়ন্ত্রন পদ্ধতি গ্রহণকারী নারী	%	৩৫.০	৪১	৪৪	২০০১ (নির্পোট, ২০০৩)

জেলার অবস্থান

জাতীয় অবস্থার তুলনায় ভাল দিক

- সাক্ষরতার হার (৭^{+}) ৬৬%, যা জাতীয় (৪৫%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৫১%) তুলনায় বেশি।
- জেলায় দারিদ্রপীড়িত ও অতি দরিদ্র গৃহস্থালির সংখ্যা (৩৮.৩%, ১৮.২%) জাতীয় (৪৯%, ২৩%) এবং উপকূলীয় হারের (৫২%, ২৪%) চেয়ে কম।
- জেলায় গড়ে প্রতি ৫৪ বর্গ কি. মি. এলাকাতে একটি হাট-বাজার কেন্দ্র রয়েছে, যা জাতীয় (৭০ বর্গ কি. মি. এ একটি) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৮০ বর্গ কি. মি. এ একটি) তুলনায় সুবিধাজনক ।
- রাস্তার ঘনত্ব ১.০১ কি.মি./বর্গ কি.মি., যা জাতীয় (০.৭২ কি.মি./বর্গ কি.মি.) ও উপকূলীয় হারের (০.৭৬ কি.মি./বর্গ কি.মি.) তুলনায় বেশি ।
- জেলায় ৫৯% ঘড় স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার সুবিধাসম্পন্ন, যা জাতীয় (৩৭) এবং উপকূলীয় অঞ্চলের হারের (৪৬%) তুলনায় বেশি।
- হাসপাতালে শয্যা প্রতি জনসংখ্যা ৩,৮৮২ জন, যা জাতীয় (৪,২৭৬) ও উপকূলীয় (৪,৬৩৭) হারের তুলনায় ইতিবাচক।
- জেলায় কোন প্রত্যন্ত অঞ্চল নেই।
- নিম্ন মাত্রার লিঙ্গীয় অসমতা ।

জাতীয় অবস্থার তুলনায় দুর্বল দিক

- জেলায় ভূমিহীনের সংখ্যা ৫৫.৪%, যা জাতীয় (৫২.৬%) এবং উপকূলীয় অঞ্চলের তুলনায় (৫৩.৫%) বেশি।
- জেলার মোট নিরাপদ পানির সুবিধাপ্রাপ্ত গৃহ ৮৪%, যা জাতীয় (৯১%) ও উপকূলীয় হারের (৮৮%) তুলনায় কম।
- ঝালকাঠী জেলায় মাথাপিছু আয় ১২,৮৮৩ টাকা, যা জাতীয় (১৮২৬৯ টাকা) ও সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলের (১৮,১৯৮ টাকা) তুলনায় কম।
- জেলার বার্ষিক আয় প্রবৃদ্ধির হার ৪.১%, যা জাতীয় (৫.৪%) ও উপকূলীয় হারের (৫.৪%) চেয়ে কম।
- মোট আয়ে শিল্প খাতের অবদান ১৬%, যা জাতীয় (২৫%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের হারের (২২%) তুলনায় কম।
- জেলার মোট বিদ্যুৎ সংযোগের পরিমাণ ২২%, যা জাতীয় (৩১%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৩১%) তুলনায় অনেক কম।
- ক্ষুদ্র কৃষকের সংখ্যা ৫৯%, যা জাতীয় (৫৩%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৫৮%) তুলনায় বেশি।
- জেলার নবজাতক মৃত্যুর হার ৫২%, যা জাতীয় হারের (৪৩%) তুলনায় বেশি এবং উপকূলীয় অঞ্চলের বিবেচনায় (৫০.৬-৬৮%) প্রায় সমান।
- জেলা শহরে জনসংখ্যা ১৭%, যা জাতীয় (২৩%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (২৩%) তুলনায় অনেক কম।

উপজেলা তথ্য সারণী

বিষয়		একক	ঝালকাঠী	উপজেলা				তথ্য সূত্র ও বছর
				সদর	নলসিটি	রাজাপুর	কাঠালিয়া	
এলাকা/ প্রশাসনিক	এলাকা	বর্গ কি.মি.	৭৪৯	২০৪	২৩৭	১৬৪	১৫২	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	ইউনিয়ন / ওয়ার্ড	সংখ্যা	৫০	১৯	১৯	৬	৬	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	মৌজা / মহল্লা	সংখ্যা	৪৮৯	২০৭	১৬২	৭৩	৪৭	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	গ্রাম	সংখ্যা	৪৫১	১৮৮	১৩৬	৭৫	৫২	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
জনসংখ্যা	মোট জনসংখ্যা	লাখ	৬.৯২	১.৯৪	২.১৬	১.৪৫	১.৩৬	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	পুরুষ	লাখ	৩.৪৪	০.৯৭	১.০৮	০.৭০	০.৬৭	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নারী	লাখ	৩.৪৮	০.৯৬	১.০৮	০.৭৪	০.৬৮	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	জনসংখ্যার ঘনত্ব	জন/বর্গ কি.মি.	৯২৫	৯৪৯	৯১৩	৮৮৬	৮৯৮	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	লিঙ্গ অনুপাত	অনুপাত	৯৯	১০১	১০০	৯৮	৯৫	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	গৃহস্থালির মোট সংখ্যা	লাখ	১.৪৬	০.৪১	০.৪৪	০.৩১	০.২৮	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	গৃহস্থালির আকার	জন/গৃহস্থালি	৪.৮	৪.৬৪	৪.৮৬	৪.৭০	৪.৮২	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নারী প্রধান গৃহ	মোট গ্রামীণ গৃহস্থের %	৪.৭৭	২.৮	২.৫	৩.২	৩.১	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
তৌত অবকাঠামো	টেকসই দেয়ালসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৬৫	৬৫	৬৪	৬৫	৬৭	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
	টেকসই ছাদসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৬২	৬৪	৭০	৫৬	৫৩	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
	বিদ্যুৎ সংযোগসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৬	১০.৬৮	২.৭৬	৬.০৩	৪.৮১	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
	প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোট সংখ্যা	৬৪২	১৮৫	১৯০	১৩৩	১৩৪	২০০১(প্রা.শি.অ, ২০০৩)
	মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মোট সংখ্যা	১৮৮	৫৩	৪৮	৫২	৩৫	২০০২ (ব্যানবেইস, ২০০৩)
	মহাবিদ্যালয়	মোট সংখ্যা	১৮	৮	৩	৪	৩	২০০২ (ব্যানবেইস, ২০০৩)
অর্থনীতি	কৃষি শ্রমিক	মোট গ্রামীণ গৃহস্থের %	২৬	২৭	২৩	২৪	৩১	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
	কৃষি প্রধান পরিবার	মোট গ্রামীণ গৃহস্থের %	৭৫	৮১	৬৯	৮১	৮২	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
	অকৃষি প্রধান পরিবার	মোট গ্রামীণ গৃহস্থের %	২৫	১৯	৩১	১৯	১৮	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
	মোট চাষের জমি	হেক্টর	৪৪২৫৭	১২৮৫৯	৯৯২০	১০৮০৩	১০৬৭৫	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
	এক ফসলী	মোট কৃষি জমির (%)	৪৫	৪৯	১২	২৮	৩৫	২০০৩ (বাংলাপিডিয়া, ২০০৩)
	দো ফসলী	মোট কৃষি জমির (%)	৩৮	৩৮	৭৮	৫৮	৪৮	২০০৩ (বাংলাপিডিয়া, ২০০৩)
	তিন ফসলী	মোট কৃষি জমির (%)	১৭	৩৮	১০	১৪	১৭	২০০৩ (বাংলাপিডিয়া, ২০০৩)
	প্রতি ০.০১ হেক্টর জমির মূল্য	টাকা	৯০০০	৫০০০	৪০০০	৪০০০	১৩০০০	২০০৩ (বাংলাপিডিয়া, ২০০৩)
শিক্ষা	সাক্ষরতার হার (৭ বছর$^{+}$)	%	৬৬	৬৫	৬৩	৬৯	৬৮	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার	৬-১০ বছর শিশু (%)	১০০	৯৮	৯৯	৯৮	১০৮	২০০১(প্রা.শি.অ)
	মেয়ে	৬-১০ বছর শিশু (%)	১০২	৯৮	১০০	১০২	১১৫	২০০১(প্রা.শি.অ)
স্বাস্থ্য	সক্রিয় টিউবওয়েল	সংখ্যা	৯৭১১	২৯১৮	২৮৯০	২১৭৫	১৭২৮	২০০২ (ডি.পি.এইচ.ই, ২০০৩)
	কল অথবা নলকূপের পানির সুবিধাপ্রাপ্ত ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৫২	৬৮	৫১	৫১	৩৩	১৯৯১(বি.বি.এস, ১৯৯৪)
	স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার সুবিধাপ্রাপ্ত ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	১০	১৩	৭	৯	৯	১৯৯১(বি.বি.এস, ১৯৯৪)

প্রকৃতি ও পরিবেশ

ভৌগোলিক অবস্থান, সবুজ গাছ-গাছালি, নদী, খাল, বন্যা, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস ও নদী ভাঙন নিয়ে ঝালকাঠী জেলার একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, এ জেলায় রয়েছে এক সময়ের ক্ষুদ্র শিল্প ও বাণিজ্যের ঐতিহ্য। এ জেলা কৃষি ও বাণিজ্য নির্ভর। জেলার সর্বত্র বনজ ও ফলজ গাছ-গাছালি আর ফসলের মাঠ। ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যায় যে বৃহত্তর বরিশালে দক্ষিণ অংশ জুড়ে ছিল সুন্দরবন। আর তারই অংশ হচ্ছে বর্তমান ঝালকাঠী জেলা। মানুষ নিজের প্রয়োজনে যেমন বন কেটে করেছে ফসলের মাঠ, আবাসভূমি, তেমনি প্রয়োজনে আবার গাছ লাগিয়েছে।

পদ্মা-মেঘনা, আড়িয়াল খাঁ নদীর অববাহিকায় এ জেলা। পদ্মা-মেঘনার পলি আর সমুদ্রের পলি মাটিতে গড়া এ জেলা। জেলার দক্ষিণে লবণ পানি, আর উত্তরে মিঠাপানির সংমিশ্রনে গড়ে উঠেছে জেলার প্রকৃতি। প্রাকৃতিক জোয়ার-ভাটার কারণে ভূমির উর্বরতা অনেক বেশি।

প্রাকৃতিক পরিবেশ

নদী ও খাল : পদ্মা, মেঘনা, আড়িয়াল খাঁ ও সুগন্ধা নদীর অববাহিকায় ঝালকাঠী জেলা। আর এ চারটি নদী থেকে কয়েকটি শাখা নদী বের হয়ে এ জেলার বুক চিরে বয়ে গেছে সাগরে। জেলার নদীগুলোর মিঠাপানি ভাটিতে গিয়ে লোনা জলে মিশেছে। ঝালকাঠীর প্রকৃতি নদী নির্ভর। জেলার প্রধান নদীগুলো হচ্ছে বিশখালী, জাঙ্গালিয়া, ধানসিঁড়ি, গাবখান, বামনদা ও সুগন্ধা। এ ছাড়া, এ জেলায় বেশ কয়েকটি ছোট নদী ও খাল রয়েছে। যেমন কুমারখালী, পেনাবালীয়া, বাদুরতলা ভারানী ঘোষের হাট ও ভারানী ইত্যাদি। এক সময়ে বলা হত ধান নদী খাল, এই তিনে বরিশাল। আর বর্তমানের ঝালকাঠী জেলা সেই বরিশালের একাংশ। এ জেলায় মোট ১১৫ কি. মি. নদী রয়েছে। জেলার মোট আয়তনের ৪.৫% নদী। জেলার ইতিহাস ও বর্তমান ভৌগলিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় এ জেলার একটি বৃহৎ অংশ সুগন্ধা বা সন্ধা নদীর চর দিয়ে গড়া সুন্দরবনেরই অংশ।

ঝালকাঠী জেলার সব নদী ও খাল প্রবাহমান। প্রতিদিন জোয়ার-ভাটা হয়। সব নদীই নাব্য এবং সারা বছর ধরে নৌ চলাচল করে। স্থানীয় কিছু নদী বা খাল আছে। যেমন কালিজিড়া, পঞ্চগ্রাম খাল, গুঠিয়ার খাল । এসব খাল পলি পরে নাব্যতা হারাচ্ছে। এমন কি ঝালকাঠী-পিরোজপুরের সংযোগ খাল গাবখান চ্যানেলও পলি পরে গভীরতা এবং প্রশস্ততা কমে যাচ্ছে।

পুকুর : জেলার সর্বত্রই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে নানা ধরনের পুকুর, যার মোট এলাকা ২,৩৩৫ হেক্টর। এর মধ্যে মাছ চাষ করা হয় ১,৬২১ হেক্টর পুকুরে। জেলার পতিত পুকুরের পরিমাণ ২৭৭ হেক্টর। এসব পুকুর থেকে মোট ৭,৩০০ মে: টন মাছ উৎপাদিত হয় (সূত্র: মৎস্য বিভাগ ২০০৩)। পুকুরে যে ধরনের মাছ চাষ হয় সেগুলো হচ্ছে রুই, কাতল, মৃগেল, গ্রাসকার্প, কালি বাউশ, সিলভার কার্প ও তেলাপিয়া, নাইলোটিকা ইত্যাদি।

মোট পুকুরের পরিমাণ	২,৩৩৫ হে.
মাছ চাষের পুকুর	১,৬২১হে.
মাছ চাষযোগ্য পুকুর	৪৩৭হে.
পতিত পুকুর	২৭৭ হে.

জলবায়ু : বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানের মত এ জেলা ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ুর অন্তর্গত। এ জেলায় ষড়ঋতুর মধ্যে তিনটি মৌসুম জোড়ালোভাবে পরিলক্ষিত হয়। গ্রীষ্ম মৌসুম সাধারণত মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত। এ সময়কে প্রাক বর্ষাকাল বলে গণ্য করা হয়। এ সময় বাতাস খুবই উত্তপ্ত হয় এবং বাতাসে জলীয় বাষ্প খুবই কম থাকে। এ জেলায় কালবৈশাখী ও শিলা বৃষ্টির প্রকোপ রয়েছে। 'বর্ষা' মৌসুম স্থায়ী হয় জুন হতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত। বছরের প্রায় ৯০% বর্ষণ এ সময় হয়। নভেম্বর থেকে শীত শুরু হয় এবং ফেব্রুয়ারি মাসে শেষ হয়। শীতের সময় এ জেলা বেশ কুয়াশাচ্ছন্ন থাকে।

মাটি : জেলার ভূ-প্রকৃতি সমতল ধরনের। ঝালকাঠী জেলার মাটি পলিময় এঁটেল ধরনের। জেলার কিছু এলাকায় দো-আঁশ মাটির আধিক্য রয়েছে। এ জেলাকে প্রধানত দুটি ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। যেমন (ক) মেঘনা পলল ভূমি এবং (খ) গংগা কটাল পললভূমি।

ক) মেঘনা পলল ভূমি : জেলার দক্ষিণ-পূর্বভাগ এ ভূ-প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত। বিশেষ করে দক্ষিণে চর এবং দ্বীপের ভূ-প্রকৃতি লবণাক্ত সমুদ্র পললভূমি দ্বারা গঠিত। এ এলাকা সাধারণত বৃষ্টি ও জোয়ারের পানিতে স্বল্প গভীরভাবে প্লাবিত হয়।

খ) গংগা কটাল পলল ভূমি : জেলার উত্তর পশ্চিম এলাকা এ ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এলাকাটি অপেক্ষাকৃত পুরাতন সমতল ডাংগা এবং প্রশস্ত বিল ভূমি দ্বারা গঠিত এবং ছোট বড় খাল দ্বারা বিভক্ত। এ এলাকা সাধারণত বৃষ্টি ও জোয়ারের পানিতে স্বল্প প্লাবিত হয়। জেলায় এ পলল ভূমির পলি গংগার উৎস হতে আগত। দুটি ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চলেই বসতবাটি ও প্রশস্ত নদী আছে।

বনভূমি : ঝালকাঠী জেলায় কোন সংরক্ষিত প্রাকৃতিক বনভূমি নেই। এ জেলার দক্ষিণাংশ এক সময় সুন্দরবনের অংশ ছিল। বর্তমানে এ জেলায় মানুষের লাগানো প্রচুর গাছ-গাছালি রয়েছে। যেমন কড়ই, রেইনট্রি, আম, কাঁঠাল, গাব, জাম, নিম, তেতুল, কদম, শিমূল, কাউফলা, বেল, জারুল ও সোনাল, রয়না কাঠ বাদাম ইত্যাদি।

নার্সারী : এ জেলায় গাছের চারা উৎপাদনের জন্য সরকারি ও বেসরকারিভাবে বেশ কিছু নার্সারী গড়ে উঠেছে। বিশেষ করে ঝালকাঠী সদর নলসিটি, রাজাপুর উপজেলায় এ নার্সারী শিল্প বৃদ্ধি পাচ্ছে। জেলার বিভিন্ন হাটে ও সদর উপজেলা হাটে এ নার্সারীর তৈরি প্রচুর চারা পাইকারী বেচা কেনা হয়। এ সকল নার্সারীতে বিভিন্ন রকমের চারা তৈরি হয় যেমন মেহগনি, পাহাড়ি কড়াই, সেগুন, রেইনট্রি, জলপাই, হরতকী, আমলকী, আম, জাম কাঁঠাল, বেল, কদবেল, নারিকেল, সুপারি, করমজা, লেবু, ছবেদা, শরীফা, আতা, ডালিম প্রভৃতি। এ জেলা থেকে প্রচুর পরিমাণ গাছের চারা দেশের বিভিন্ন জেলায় সরবরাহ করা হয়। এ জেলায় ফলজ গাছের মধ্যে রয়েছে আমড়া, আম, জাম, কাঁঠাল, নারিকেল, তাল, পেয়ারা, শরীফা, আতা, কলা, জামরুল, লটকন, জামবুড়া ও ছবেদা। বর্তমানে এ জেলার মানুষ গাছ লাগানোর প্রতি আরো উৎসাহিত হয়েছে এবং গ্রামের মানুষ এখন তাদের অর্থনৈতিক লাভ এবং প্রয়োজনীয়তার প্রতি নজর রেখেই গাছ গাছালি লাগাচ্ছে।

সামাজিক বনায়ন : এ জেলায় সরকারি উৎসাহে বেসরকারিভাবে সামাজিক বনায়ন করা হয়েছে। তাই বসতভিটা ও উঁচু জায়গায়, এমনকি জমির আলে প্রচুর গাছ লাগানো হচ্ছে। সাধারণ মানুষ এখন গাছের অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছে। একইভাবে জেলার সকল প্রকার রাস্তাঘাটের দুই পাশে প্রচুর গাছ লাগান হয়েছে। এ জেলায় বিশখালী নদীর দুই ধারে পানি উন্নয়ন বোর্ডের বাঁধ রয়েছে। সেই বাঁধের দুই ধারে সরকারি সবুজ বেষ্টনী প্রকল্পের অধীনে প্রচুর গাছ লাগান হয়েছে। এ ছাড়াও স্থানীয় সরকার, সড়ক বিভাগ, উপজেলা পরিষদ থেকেও প্রচুর গাছ লাগান হয়েছে। জেলায় সাধারণত বেশি দেখা যায় আম, কাঁঠাল, জাম, আমড়া, তাল, বেল,

নারকেল, সুপারি, বাবলা, শরীফ, কামরাঙ্গা, চালতা, জামরুল, গাব, বিলেতি গাব, রেইনট্রি, কড়ই, শিশু মেহগনি, পাহাড়ী কড়ই, নিম, হরতকী, রয়না, বয়রা ইত্যাদি।

উদ্ভিদ ও জীব বৈচিত্র্য : জেলার উত্তর অংশ লবণবিহীন পলি এবং দক্ষিণ অংশ সামান্য লবণযুক্ত পলি দ্বারা গঠিত। স্বাভাবিক কারণেই উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলের মধ্যে উভয়েরই প্রভাব রয়েছে। ঝালকাঠী জেলার সর্বত্র বিভিন্ন রকমের দেশীয় গাছ-গাছালি দিয়ে ঘেরা। গ্রামের বেশিরভাগ বাড়িতেই ঝোপঝাড়, বাঁশ ঝাড়, কলার ঝাড়, নারিকেল সুপারি গাছ রয়েছে। বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানে যে সকল গাছ রয়েছে এ জেলায়ও সেগুলো দেখা যায়। যেমন আম, কাঁঠাল, বেল, নারিকেল, আতাফল, শরিফা, কামরাঙ্গা, পাতরাজ, সুপারি, নিম, কড়ই, টল্লাবন, হিজল, অরিআম, শিমুল, বিলাতিগাব, পলাশ, পেঁপে, সোনালু, জামবুরা, মান্দার, বট, অশ্বথ, ডুমুর, জারুল, দেশী গাব, সাজনা, খেজুর, দেবদারু, পেয়ারা, রেইনট্রি, জাত কড়াই ইত্যাদি। এ ছাড়াও জেলায় আরো বিশেষ কিছু গাছ দেখা যায় যেমন চালতা, পাইনাল, কাউ, করমচা, ছৈইলা, আমরা, জলপাই ও পলাশ ইত্যাদি। ঝালকাঠী জেলায় এখনও কিছু কিছু সুন্দবনের গাছ দেখা যায়। যেমন গাব, হরতকী, কেওড়া, বয়রা ও রয়না। এ ছাড়াও নদীর পাড়ে হোগলাপাতা, নলবন ও কেও কাঁটার ঝোপঝাড় রয়েছে। স্থানীয় তৃন-লতাপাতার মধ্যে দেখা যায় হাবজাযা, নোলা জাও, টামবুল কাটা, ছোদাবান, সুন্দরী লতা, শিংগারা, কালশি ইত্যাদি।

সুন্দরবন এলাকার কিছু প্রাণী একসময় এখানেও দেখা যেত। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বিভিন্ন জাতের কুমির, হাঙ্গর, খরগোস, ডোরাবাঘ, বন্য শুকর, চিত্রা হরিণ ইত্যাদি। ঝালকাঠী জেলার প্রধান প্রধান প্রাণীর মধ্যে বানর, মেঁছো বিড়াল, বাগদাস, খাটাস, গন্ধগোকূল, ছোট বেজী, সাধারণ বড় বেজী, পাতিশিয়াল, জ্যাকাল, উদবিড়াল বা উদ বা ধাড়ে, কলাবাদুড়, মধ্যম আকারের বাদুর, ভুয়া রক্ত চোষা বাদুড়, চামচিকা, ব্রাশজেলা সজারু, চুড়াহীন হিমালয়ী সজারু, বাটা, কালো ইঁদুর, বাইট্যা বা নেংটি ইঁদুর, ব্যাণ্ডীকোটা ইঁদুর, ছোট ব্যাণ্ডিকোটা ইঁদুর, চিকা, পদ্মা শুশুক, বাহু ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

এ জেলায় সরিসৃপের মধ্যে দেখা যায় সুন্দি কাছিম, কাউটা কাছিম, মগম কাছিম ও দুরা, টিকটিকি, রক্তচোষা, তক্ষক বা তক্ষণাথ, আর্জিনা, গুইসাপ, দেয়াল টিকটিকি, অজগর বা ময়লা, একচক্র জাতিসাপ, দ্বিচক্র জাতিসাপ, শঙ্খীনি বা সাপনী বা মামাভাগনে বা দুমুখো সাপ, কেউটে, ঢোড়া সাপ, মাইটে সাপ, মাছো রাঙ্গা সাপ, দাড়াস বা ধামন সাপ, লাউডগা ইত্যাদি। এগুলোর মধ্যে জাতি, শঙ্খিনী, কেউটে, চন্দ্র বোড়া, বিষধর।

এ জেলায় বহু পাখ-পাখালী দেখা যায়। পাখীদের মধ্যে রয়েছে ডুবুরী, ছোট পানকৌড়ি বা ছোট পানিকামড়ি, গয়ার বা সাপ পাকি, কর্চি বক বা গুজা বক, মহিষে বক বা গো বক, ডাড় বক বা ধলি বক, মাঝারি বক, চোট বক, নিশাবক বা অক, রঙ্গিলা বা সোনডঙ্গা, ঘোঙটা বা চামচ মুখি, ভবন চিল, শঙ্ক চিল বা লাল চিল, কোরা ঈগল (সাদা ঈগল), ডাহুক, কোরা, কালো কুট, জলপিপি, লাল হোট টিটি, হলুদ হোটাটিটি, জল চা পাখি, সুচ লেজা চ্যাগা, বাটান, রঙিগলা চ্যাগা, পদ্মা জল কবুতর, কালো মাথা জল কবুতর, মাছ খেকো গাঙ চিল, কালচে গাঙ চিল, কপোত বা বুনো কবুতর, সবুজ কবুতর বা হরিয়াল, সবুজ ঘুঘু, লাল ঘুঘু, রাজ ঘুঘু বা ধোরাল ঘুঘু, টিলা ঘুঘু, চোখ গেলো, বউ কথা কও, পাপিয়া, কালো কোকিল, কানা কোয়া, লক্ষী পেচা, নিম পেচা, ভুতুম পেচা, কাঠুরে পেচা বা ছি যুক্ত পেচা, নাককাঠী, আবাবিল, পাকরা মাছরাঙা, জবুজ সুই চোর, নীল কণ্ঠ, হুদ হুদ, ছোট ভগীর বা বসন্ত বাউরী বা কপার স্মিথ, বড় ভগীরথ, নীলগলা ভগীরথ, মেঠো কুড়ালী বা কাঠ ঠোকরা, সবুজ কুড়ালী, ক্ষুদে সোনালী কুড়ালী, বড় সোনালী কুড়ালী, পুবে আকাশি ভরত, সাধারণ সোয়ালো, বাঘাটিকি, বাদামী কসাই পাখি, কালোমাথা হলদে পাখি বা হলুদিয়া পাখি বা বেনে বউ, কালো ফিঙ্গে, গুবরে মালিক, কাঠ শালিক, ভাত শালিক, ঝুট মালিক, তাড়ুয়া বা হাড়ি চাচা, পাতি কাক, দাঁড় কাক, ক্ষুদে সাত সেলি, ফটিকজল, সিপাহী বুলবুল, বুলবুল, লাল বুক চোটক, সাদা ভুরু বরন বাটা, টুনটুনি, সবুজ পাতা ওয়ার্বলার, বাদামী পাতা ওয়ার্বলার, দোয়েল, সাতেরি, সাত ভাইলা, ধুসর টিট, বাদামী উড নাটাক, গেছো পিপিট, সাদা খঞ্জনা, হলুদ মাথা খঞ্জনা, ফুলচুষি, বেগুনী মৌচুষি, বেগুনী পুচ্ছ ভিত্তি মৌচুষি, ছিটামুনিয়া, লাল মুনিয়া, বাবুই বা বয়নকারী পাখি, চড়ুই ইত্যাদি।

এ জেলায় শীতকালে বিশখালী নদীর চরে দেশী ও অতিথি পাখির সমাগম ঘটে। এ শীতকালীন পাখিদের মধ্যে বুনো রাজহাঁস, ছোট সরাল বা মরাল, বড় সরাল বা মরাল, বামন হাঁস, বালি হাঁস, চখাচখি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

কৃষি সম্পদ

জেলার নদীগুলোতে সারা বছর নিয়মিত জোয়ার-ভাটা হয়, ফলে প্রচুর পলিমাটি জমে। এ কারণে এ অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের ফসল ফলে। এ এলাকা সারা বছরই সবুজের সমারোহ। আশ্বিন-কার্তিক মাসে ফসলের মাঠ আর গ্রামগুলো গাঢ় সবুজে ভরা থাকে। আবার অগ্রহায়ণের শুরু থেকেই সোনালী ধানের সমরোহে যেন প্রকৃতির সীমাহীন সৌন্দর্য্যের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয় এ জেলা। ঝালকাঠী জেলার অর্থনীতি মূলত কৃষি নির্ভর। এ জেলার বেশিরভাগ ভূমিই কৃষি চাষাবাদের জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে। এ জেলায় মোট চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ৪৪২৫৭ হেক্টর এবং জেলার ৭৮% পরিবারই কৃষির সাথে সম্পৃক্ত।

প্রধান ফসল : এ জেলার প্রধান ফসল ধান। প্রধানত তিন ধরনের ধানের চাষ হয়ে থাকে। যেমন দেশীয় জাতের রোপা আমন ও উচ্চ ফলনশীল রোপা আমন এবং উচ্চ ফলনশীল বোরো। এ ছাড়াও কিছু কিছু এলাকায় আউশ ধানের চাষ হয়। জেলার অন্যান্য ফসলের মধ্যে রয়েছে গম, পাট, ডাল, তেলবীজ, হলুদ, মরিচ, পিঁয়াজ, গোল আলু, মিষ্টি আলু ইত্যাদি।

জেলায় প্রচুর পরিমাণ শীতকালীন এবং গ্রীষ্মকালীন সবজি জন্মে যেমন ফুলকপি, বাঁধাকপি, শালগম, সীম, আলু, বেগুন, বটবটি, লাউ, মানকচু, মিষ্টি কুমড়া ইত্যাদি। এ ছাড়াও গ্রীষ্মকালে জন্মে করল্যা, চিচিংগা, ঝিংগা, ডেড়শ, শশা, চালকুমড়া, নারিকেলী কচু, ওল কচু কাকরোল ইত্যাদি। এ জেলায় প্রচুর শাক জন্মে, যেমন পালং শাক, লাল শাক, ডাটা শাক, পুঁই শাক ইত্যাদি।

ঝালকাঠী জেলায় প্রধান প্রধান অর্থকরী ফসলের মধ্যে রয়েছে নারিকেল, সুপারি, কলা, পেয়ারা, পান, আখ ও আমড়া। ঝালকাঠী সদর জেলাহাটে এ সব ফসল বা ফলের পাইকারী বড় বাজার বসে এবং এ বাজার থেকে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করা হয়। এ জেলার সদর উপজেলা ও নলছিটি উপজেলায় প্রচুর শাক-সবজি চাষ হয়। সদর উপজেলার উত্তর-পশ্চিমে ১৫টি গ্রামে আখ ও পেয়ারা চাষ হয়।

সমন্বিত চাষ : কৃষিনির্ভর এ জেলায় চাষাবাদের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সমন্বিত চাষ। সদর উপজেলার উত্তরে ১৫টি গ্রামে এ পদ্ধতির চাষ দেখা যায়। এ চাষের ধরন হচ্ছে কোন একখণ্ড জমির চতুর্দিকে লম্বালম্বিভাবে পরিখা খনন করে, পরিখার মাটি দিয়ে জমির মাঝের অংশটা উঁচু করা হয়। যাতে স্বাভাবিক বন্যার পানিতে ডুবে না যায়। এ চাষের ক্ষেত্রে দেখা যায় একই জমিতে বছরে বিভিন্ন রকমের ফসল হয়ে থাকে। যেমন পেয়ারা, আখ, কচু, শীতকালীন সবজি, মরিচ ইত্যাদি। এ ধরনের তৈরি করা চাষযোগ্য জমিকে কান্দি বলা হয়।

পেয়ারা : পরিখার ভিতরের উঁচু করা জমির চারিদিকে একটি নির্ধারিত দূরত্ব বজায় রেখে পেয়ারা গাছ লাগানো হয় এবং পেয়ারা গাছের ডালপালাগুলো পরিখার দিকে ঝুলে থাকে। এ পরিখা থেকে প্রতি বছর পেয়ারা গাছের গোড়ায় পলি পড়া কাঁদামাটি দেয়া হয়। জেলায় প্রায় ৭/৮ কোটি টাকার পেয়ারা জন্মায়, যা বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় বাজারজাত করা হয়।

আখ : পেয়ারা গাছের ভিতরের অংশে লাইন করে আখ চাষ করা হয় এবং এ আখগুলোকে পেয়ারা গাছ ঝড়/বৃষ্টি থেকে রক্ষা করে। এ জেলায় বছরে প্রায় ৭-৮ হাজার মেট্রিক টন ইশ্বরদী- ১৮ ও তুরপীন জাতের আখ জন্মে।

সবজি চাষ : শীতকালে এ সকল জমিতে শাক-সবজি চাষ হয়। দুটি পেয়ারা গাছের মাঝে যেটুকু দূরত্ব রয়েছে সেখানে লাউ ও সীমের চাষ করা হয়। ভাদ্র মাসে যখন আখ কাটা শেষ হয়ে যায় তখন ঐ জায়গায় আখের লাইনের মাঝে শালগম, ফুলকপি, বাঁধা কপি, বেগুন ও মরিচের চাষ করা হয়।

পেয়ারা ও আখ চাষ করার জন্য যে পরিখা খনন করা হয় সেখানে কৃষকরা কার্তিক মাসে কচুর চারা লাগায়। খুবই সামান্য যত্নে এ সবজি বড় হয়, স্থানীয়ভাবে এ কচুকে নারকেলী কচু বলে।

মাছ : কান্দি তৈরি করতে যে পরিখা খনন করা হয় এ জায়গায় কচু তুলে নিয়ে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে ডাল পালা (কাটা) দিয়ে রাখা হয়। ফলে এ সকল পরিখার মধ্যে বর্ষাকালে খাল বিলের বিভিন্ন রকমের মাছ এসে জমা হয় এবং কার্তিকের শেষে এ পরিখার পানি চলাচল বন্ধ করে দেয়া হয়। মাঘ-ফাল্গুন মাসে মাছ ধরা হয়। শিং, কই, মাগুর, শোল, গজার, পুটি, ট্যাংরা, মেনি, চিংড়ি ইত্যাদি মাছ পাওয়া যায়।

পশু সম্পদ : জেলায় পশুসম্পদের মধ্যে তেমন কোন বিশেষত্ব নেই। বাংলাদেশের অন্য জেলাগুলোতে যেভাবে পশু লালন-পালন করা হয় এখানেও একই রকম। জেলার পশু সম্পদের মধ্যে দেখা যায় হাঁস, মুরগি, গরু, ছাগল, মহিষ ইত্যাদি। জেলার বেশিরভাগ গৃহস্থই হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল, মহিষ লালন পালন করে থাকে। ১৯৯৬ সালের কৃষি শুমারি অনুসারে জেলার গ্রামীণ এলাকায় মোট ৪৯৮২৭টি গৃহে গবাদিপশু রয়েছে, যা মোট গ্রামীণ গৃহস্থালির ৪৫%। জেলায় গবাদিপশুর সংখ্যা মোট ১৪৬৩৮০টি এবং ঘর প্রতি গবাদি পশুর সংখ্যা ২.৯৪টি।

মৎস্য সম্পদ

উপকূলীয় এলাকায় স্থানীয় যে সব সম্পদ রয়েছে তার মধ্যে মৎস্য সম্পদ অন্যতম। আর এ মৎস্য সম্পদ রয়েছে দুই ধরনের। যেমন সামুদ্রিক মাছ এবং মিঠা পানির মাছ। এ জেলা যেহেতু প্রত্যক্ষ সমূদ্র উপকূলীয় অঞ্চল নয়, তাই জেলায় মিঠা পানির মাছই বেশি। তবে জেলার সব উপজেলাতেই মিঠা পানির মাছ এবং সমুদ্রের মাছ সমান জনপ্রিয়।

সমুদ্রের মাছ : এ জেলার হাট বাজারগুলোতে বেশ কিছু সামুদ্রিক মাছ পাওয়া যায় যেমন সামুদ্রিক রিঠা, ফাইস্যা, লইট্যা, ভোল, কোড়াল, রূপচাঁন্দা, বাটা, ভেটকী, সাদা পোয়া, সাগর চাপিলা,

শাপলা পাতা, তুলার ডাটি ইত্যাদি। এ সকল মাছ সাধারণত বরগুনা জেলার বিভিন্ন পাইকারি বাজার থেকে পাইকারগণ কিনে এ জেলায় বাজারে বিক্রি করে। তবে এর মধ্যে কিছু কিছু মাছ বিশখালী নদীতে স্বল্প পরিমাণে পাওয়া যায়, যেমন পোয়া, তাপসী, তুলারডাটি, ভাটা, শিলং, ভ্যাটকি ও ইলিশ ইত্যাদি। বিশখালী নদীর ইলিশ খুবই বিখ্যাত।

মিঠা পানির মাছ : জেলার নদী, খাল-বিল, জলাশয় ও পুকুরে প্রচুর মিঠা পানির মাছ পাওয়া যায়। এ সকল মাছ হচ্ছে- কই, শিং, মাগুর, চাপিলা, কাচকি, ফ্যাসা, চিতল, ফলি, রুই, কাতলা, ঘনিয়া, কালিবাউশ, নানদিনা, মৃগেল, রায়েক, কমনকার্প, ঘেসো রুই, সরপুটি, থাই সরপুটি, চোলাপুটি, তিতপুটি, ফুটনী পুটি, দেতো পুটি, কোসাপুটি, কাঞ্চন পুটি, মলা, নারকেলি চেলা, ছ্যাপচেলা, বাঁশপাতা, গুজি আইর, তল্লা আইর, গোলসা টেংরা, গুলো টেংরা, বুজুরী টেংরা, কাউনে, রিটা, রোল, গাউড়া, কাজলি, বাচা, সিলেন্দা, পাঙ্গাস, বাঘা আইর, গজার, শোল, টাকি, তেলো টাকি, কুচে, টাকা চান্দা, ভেদা, নাপতে কতই, তুণ্ডবেলে, ডোরা বেলে, লাল চেউ, ডরকী চেউ, খলিসা, বইচা, খল্লা, কেচি খল্ল, তপসে, বড় বাইন, গুটি বাইন, তার বাইন, টেপা ইত্যাদি।

দুর্যোগ

ঝালকাঠী জেলা উপকূলীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ এলাকা হিসেবে পরিচতি। যদিও এ জেলাকে তীরবর্তী উপকূল (Exposed coast) হিসেবে গণ্য করা হয়নি। জেলার প্রধান দুর্যোগের মধ্যে রয়েছে জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, পানি ও মাটির লবণাক্ততা, আর্সেনিক ইত্যাদি। এ ছাড়াও মানুষের অসচেতনতা, জ্ঞানের অভাব ইত্যাদি কারণে পরিবেশগত বিভিন্ন সমস্যা হয়।

জলোচ্ছ্বাস : এ জেলায় জলোচ্ছ্বাসে কৃষি সম্পদ, পশুসম্পদ, বনজ ও ফলজ, মৎস্য সম্পদসহ বিভিন্ন রকমের অর্থকরী ফসলের প্রচণ্ড ক্ষতি হয়। এ ক্ষতি জেলার মানুষের পক্ষে কাটিয়ে উঠা কঠিন হয়ে পরে। বিশেষ করে সে ক্ষতি পোষাতে দুই-তিন বছর লেগে যায়। জলোচ্ছ্বাসের ফলে লবণ পানি উজানে চলে আসে এবং খাল, বিলে, পুকুরে ঢুকে পড়ে। ফলে মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহারের পানির কষ্ট হয়। মাটি লবণাক্ত পড়ে, যা ফসলের জন্য খুবই ক্ষতিকর।

ভরা জোয়ার : অমাবস্যা-পূর্ণিমার সময় ভরা জোয়ার দেখা দেয়। বর্ষাকালে স্বভাবতই দেশের উত্তরে নদীর পানি বাড়ে এবং সমুদ্রে নামতে থাকে। এ সময় সমুদ্রের পানির উচ্চতাও বেড়ে যায়। সমুদ্রের কোনরকম ঝড়-বাতাস বইলেই নদীর পানি সাগরে নিষ্কাশিত হয় না। ফলে নদীর পানির উচ্চতা ৪-৫ ফুট বৃদ্ধি পেয়ে ফসলের ক্ষেতে উঠে এবং বাড়ি ঘর ডুবে যায়। এতে ফসল এবং ফলজ ও বনজ গাছপালা নষ্ট হয়। বিশেষ করে পানের বরজ এবং আম-কাঁঠাল-কলাগাছ ও শাক-সবজি নষ্ট হয়ে যায়। জেলার নলছিটি, কাঠালিয়া ও রাজাপুর উপজেলায় এ সমস্যা বেশি হয়।

বন্যা : ঝালকাঠী সমতল জেলা এবং প্রচুর নদী-নালা, খাল-বিল আছে। উল্লেখ্য, পদ্মা এবং মেঘনার অববাহিকায় এ জেলা অবস্থিত। অতিবৃষ্টি এবং উত্তরে ঢল-এর ফলে এই দুটো নদীতে বন্যা দেখা দেয় এবং এ সময় সমূদ্রে পানির উচ্চতা বাড়ে। ফলে বন্যা একটি বড় ধরনের দুর্যোগ বয়ে আনে এবং কৃষি ফসলসহ সকল কিছু নষ্ট করে দেয়। ১৯৮৭-১৯৮৮ সালের বন্যা এবং ১৯৯৮ সালের বন্যায় এ জেলার জনগণের সকল প্রকার ফসল নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বিশেষ করে ১৯৮৮-১৯৯৮ - এর বন্যায় ঝালকাঠী সদর উপজেলার ফসল সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

মাটি ও পানির লবণাক্ততা : সমুদ্রের পানির উচ্চতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেই সাথে নদীর প্রবাহ দিন দিন কমে যাচ্ছে। ফলে সাগরের জোয়ারের পানি পূর্বের চেয়ে আরো বেশি উত্তরে আসছে। ফলে কৃষি জমির মাটিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং নদীর মিঠা পানিও লবণাক্ত হচ্ছে। অন্যদিকে ভূ-গর্ভস্থ পানিতেও লবণাক্ততা বৃদ্ধি

পাচ্ছে। এতে একদিকে যেমন কৃষি জমি উর্বরতা হারাচ্ছে অন্যদিকে জেলায় সুপেয় খাবার পানির সংকট দেখা দিচ্ছে।

পরিবেশ দূষণ : অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পাওয়ায় জেলার ২টি পৌরসভা ও ৪/৫টি ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্রে গড়ে উঠছে ছোট ছোট শিল্প কারখানা, যার বর্জ্য পদার্থ বেশির ভাগ ফেলা হচ্ছে নদীতে, ফলে দূষিত হচ্ছে নদীর পানি। অন্যদিকে, জমিতে রাসায়নিক সার, বিভিন্ন রকমের ঔষধপত্র ব্যবহার করায় মাটি, পানি, বাতাস দূষিত হচ্ছে। ফলে এলাকার জীব-উদ্ভিদ বৈচিত্র্য কমছে এবং কৃষি জমি উর্বরতা হারাচ্ছে।

নদী ভাঙন : ঝালকাঠী জেলায় নদী ভাঙনের সমস্যা প্রকট। এ জেলার নলছিটি, ঝালকাঠী, রাজাপুর ও কাঠালিয়া উপজেলার উপর দিয়ে বয়ে গেছে বিশখালী নদী। এ নদীর ভাঙনে বহু গ্রাম, হাটবাজার ও ঝালকাঠী শহরের পুরানো অংশের বেশির ভাগ নদীতে বিলিন হয়ে গেছে। সেই সাথে বিলীন হয়ে গেছে বহু প্রাচীন নিদর্শন। বিশেষ করে সুগন্ধা নদীর তীরে সুজাবাদ কেল্লা মসজিদ, শহরের পুরান স্টিমারঘাট, তেলের ডিপো, রাজাপুরের বাদুরতলা বন্দর, আম্মুয়াহাট, কাঠালিয়া বন্দর ও হদুয়া বাজার। এক সময় ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ঝালকাঠীকে বলা হতো দ্বিতীয় কলিকাতা, আর এ নদী ভাঙন তার চিত্র বহুলাংশে পাল্টে দিয়েছে।

নদী ভরাট : জেলার নদীগুলো দ্রুত ভরাট হয়ে যাচ্ছে। এর প্রধান কারণ হচ্ছে নদীপ্রবাহ কমে যাওয়া। ১৯৮৭-৮৮ সালের বন্যা এবং ১৯৯৮ সালের বন্যায় বালু আসার ফলে নদীর তলদেশ ভরাট হয়েছে। একদিকে নদীর গভীরতা কমে জোয়ারের লবণাক্ত পানি উপরে চলে আসতে শুরু করছে, অন্যদিকে, গ্রামের খাল-বিলগুলো ভরে যাচ্ছে। ফলে নৌ চলাচল, সেচ দেয়া এবং চাষাবাদ করা কঠিন হচ্ছে।

জীবন ও জীবিকা

জনসংখ্যা

ঝালকাঠী জেলার মোট জনসংখ্যা জনসংখ্যা ৬.৯২লাখ, যার মধ্যে পুরুষ ৩.৪৪ লাখ জন এবং নারী ৩.৪৮ লাখ । মোট জনসংখ্যার ৮৩% গ্রামে এবং ১৭% শহরে বসবাস করে। প্রতি বর্গ কি.মিটারে ৯২৫ জন লোক বাস করে যা সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলে ৭৪৩ জন/ বর্গ কি. মি.।

জেলায় ০-১৪ ও ৬০$^{+}$ বছর বয়সী জনগণ ও ১৫-৫৯ বছর বয়সী জনগণের মধ্যে নির্ভরশীলতা অনুপাত ০.৯০।

মোট জনসংখ্যা (লাখ)	৬.৯২
পুরুষ	৩.৪৪
নারী	৩.৪৮
গ্রামীণ জনসংখ্যা (লাখ)	৫.৭৫
পুরুষ	২.৮৩
নারী	২.৯২
লিঙ্গ অনুপাত	১০০:৯৯
নির্ভরশীল জনগণের অনুপাত	০.৯০
জনসংখার ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কি.মি.)	৯২৫

ঘর-গৃহস্থালি : জেলায় গৃহস্থালির ধরনে ভিন্নতা আছে। শহুরে (০.২৬ লাখ) ও গ্রামীণ (১.২০ লাখ) মিলিয়ে ঝালকাঠীর মোট গৃহস্থালির সংখ্যা ১.৪৬ লাখ । প্রতিটি গৃহস্থালির জনসংখ্যা গড়ে ৪.৮ জন।

ঝালকাঠী জেলার মোট ঘরের ৩৮% ছন, বাঁশ, পাটকাঠী ও পলিথিন দিয়ে তৈরি ও ৬০% ঘর ঢেউটিন বা টালীর তৈরি এবং ২% সিমেন্টের ছাদ। আবার এ সব ঘরের মধ্যে ৩৫% বেড়া পাটকাঠী ও বাঁশের ও ২% মাটি ও দেশীয় ইটের এবং ২২% বেড়া টিনের, ৩৮% ঘরের বেড়া কাঠের এবং ৩% ঘরের দেয়াল পাকা।

ঘরের ছাদ	%
ছন, বাশ, পাটকাঠী ও পলিথিন	৩৮
ঢেউটিন/টালী	৬০
সিমেন্টের ছাদ	২
ঘরের দেয়াল	
পাটকাঠী, বাঁশ	৩৫
মাটি ও দেশীয় ইট	২
টিন	২২
কাঠ	৩৮
পাকা দেয়াল	৩

জনস্বাস্থ্য

ঝালকাঠী জেলায় ১টি জেলা হাসপাতাল ও ৪টি উপজেলা স্বাস্থ্য-কমপ্লেক্স রয়েছে। হাসপাতালে মোট শয্যা সংখ্যা ১৭৮ টি, শয্যা প্রতি জনসংখ্যা ৩৮৮২ জন। এছাড়াও জেলায় ৫টি গ্রামীণ ডিসপেনসারী রয়েছে।

শিশু স্বাস্থ্য : এ জেলার নবজাতক মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৫২ এবং পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৮৭। জেলায় ১২-৫৯ মাস বয়সী শিশুদের মধ্যে ৮% শিশুই অপুষ্টির শিকার। এক পরিসংখ্যানে আরও দেখা গেছে যে হাম, ডিপিটি, পোলিও রোগের টিকা নিয়েছে যথাক্রমে ৭৬%, ৭৬%, ৮৯% শিশু। এ ছাড়া ৪২% শিশু ORT নিয়েছে (বিবিএস-ইউনিসেফ ২০০১)। ঝালকাঠী জেলার ৮৭% গৃহে আয়োডিনযুক্ত লবণের ব্যবহার আছে। জেলার জণগণের মধ্যে প্রধানত যে সব রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায় তা হল সর্দি, কাশি, জ্বর, ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া, পেপটিক আলসার, আমাশয়, টাইফয়েড ইত্যাদি।

পানি ও পয়ঃসুবিধা : জেলার ৫৯% ঘরে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা আছে। এ ছাড়া ৩৮% ঘরে কাঁচা পায়খানা রয়েছে এবং ৩% ঘরে কোন রকম পায়খানা নেই। শহরে এবং গ্রামের পয়ঃসুবিধার পার্থক্য স্পষ্ট। শহরে ৮৪.০% পাকা এবং ১৫. % কাঁচা লেট্রিন ব্যবহার করে। গ্রাম এলাকায় ৫৪% পাকা, ৪১% কাঁচা লেট্রিন ব্যবহার করে, ৫% লেট্রিন ব্যবহার করে না।

নিরাপদ পানির জন্য জেলার মোট গৃহস্থালির ৮৪% কল অথবা নলকূপের পানি ব্যবহার করে, বাকী ১৬% পানির অন্যান্য উৎসের উপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক জরীপে দেখা গেছে ঝালকাঠী জেলার মোট নলকূপের ৯% নলকূপের পানিতে নিরাপদ মাত্রার অতিরিক্ত আর্সেনিক রয়েছে (সূত্র : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ, ২০০২)।

শিক্ষা

জেলার জনসাধারণের সাক্ষরতার হার সন্তোষজনক। জেলার সাক্ষরতা প্রায় (৭^{+}) ৬৬% (বি.বি.এস ২০০২), অন্যদিকে প্রাপ্ত বয়স্ক অর্থাৎ ১৫ বছরের উর্ধ্বে যাদের বয়স তাদের সাক্ষরতার হার ৭০%, এর মধ্যে পুরুষ ৭৩% এবং নারী ৬৭% (বিবিএস ২০০৩)।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর - এর তথ্য অনুযায়ী জেলায় সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক স্কুল রয়েছে মোট ৬৪২টি। এর মধ্যে সরকারি ৩৬৩টি এবং বাকী বেসরকারি ও অন্যান্য স্কুল। মোট ছাত্রছাত্রী সংখ্যা সরকারি স্কুলে ৬০,৮১৫ জন এবং বেসরকারি স্কুলে ৩৩,৩১৫ জন এবং শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ২,৪৫৭। জেলায় নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে ৩৫টি স্কুল রয়েছে। এর ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ৭,১৪৮ এবং শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ৩৯৩। জেলায় মাধ্যমিক পর্যায়ে স্কুল রয়েছে ১৫৩টি। এর ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৫৯,৩৭২ এবং শিক্ষক-শিক্ষিকা ২৫৪৬। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য মোট ১১টি কলেজ রয়েছে, এর ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৩,০১৩। শিক্ষক ৫০১ এবং শিক্ষিকা ১১৫। এ ছাড়া ঝালকাঠী জেলায় ১২০টি বিভিন্ন ধরনের মাদ্রাসা রয়েছে। এ সকল মাদ্রাসায় ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ২১,৫৪৩। এর মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা ১১,২৪৭ ছাত্রীর সংখ্যা ১০,২৯৬।

সামাজিক উন্নয়ন

সাক্ষরতার হার (৭ বছর$^{+}$), স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা, শিক্ষার হার, রাস্তাঘাট, স্কুল-কলেজ, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি বিভিন্ন দিক বিবেচনায় ঝালকাঠী জেলা সামগ্রীকভাবে উন্নয়নে খুব একটা এগুতে পারেনি। জেলায় মাথাপিছু আয় (১২,৮৮৩) জাতীয় আয়ের (১৮,২৬৯) চেয়ে অনেক কম।

সাক্ষরতার হার (৭ বছর$^{+}$)	**৬৬%**
নিরাপদ পানির সুবিধাপ্রাপ্ত	**৮৪%**
স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা	**৫৯%**

প্রধান জীবিকা দল

কৃষিনির্ভর এ জেলার প্রধান ফসল ধান। জেলার অধিকাংশ পরিবারই কৃষির সাথে সংযুক্ত। প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন সাইক্লোন, নদী ভাঙন, লবণাক্ততা, বন্যা, প্রাকৃতিক সম্পদের ক্রম অবনতি, ভূমিহীনতা এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি মানুষের জীবিকার ধরনে পরিবর্তন আনছে। চাষের জমি ক্রমবিভাজন একটি পরিবারকে কৃষি কাজের উপর নির্ভরশীল করে রাখতে পারছে না। তাই কৃষক থেকে কৃষি শ্রমিকে পরিণত হচ্ছে মানুষ এবং শ্রম বিক্রির জন্য বিভিন্ন শহরে বা বন্দরে যাচ্ছে। জেলার প্রধান জীবিকা দলগুলো হচ্ছে ক্ষুদ্র কৃষক, গ্রামীণ কৃষি শ্রমিক, শহুরে শ্রমিক ও মৎস্যজীবী। এ ছাড়াও বিভিন্ন রকমের চাষাবাদ করে মানুষ সংসার চালায়, যেমন শাক-সবজি, কলা ইত্যাদি।

কৃষক : ঝালকাঠী জেলায় মোট ক্ষুদ্র কৃষিজীবী (যাদের মোট কৃষি জমির পরিমাণ ০.০৫-২.৪৯ একর) পরিবারের সংখ্যা ৬৬১৩৭ (৫৯.৮%); মধ্যম কৃষিজীবী (২.৫০-৭.৪৯ একর) ১৫৭০০ (১৪.২%) টি পরিবার এবং বড় কৃষক (৭.৫ একর +) পরিবারের সংখ্যা মোট ১৫০৬ (১৪%) টি।

কৃষি শ্রমিক : কৃষি জমি ক্রমাগতভাবে কমে যাচ্ছে, আবার পরিবার বিভাজনের ফলে মাথাপিছু জমির পরিমাণও ব্যাপকভাবে কমে যাচ্ছে। ফলে কৃষক রূপান্তরিত হচ্ছে কৃষি শ্রমিকে। জেলার মোট কৃষি শ্রমিক গৃহস্থালির সংখ্যা ২৯০৩০টি, যা মোট পরিবারের ২৬%।

শহুরে শ্রমিক : বাংলাদেশের অনান্য জেলার মত ঝালকাঠী শহরেও শ্রমিক সংখ্যা বেড়েই চলছে। গ্রাম এলাকায় যথাযথ আয়ের উৎসের অভাব ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ভূমিহীন মানুষ শহরে ভীড় জমায়। জীবিকার তাগিদে এরা কেউ কেউ নির্মাণ শ্রমিক, মুটে, মজুর, পরিবহন শ্রমিক, যোগালী হিসেবে কাজ করে। উল্লেখ্য, জেলায় নারী শ্রমিকের সংখ্যা কম। একদিকে ধর্মীয় অনুশাসন অন্যদিকে শিক্ষার হার বেশি থাকার ফলে বড় শহরে গিয়ে এরা গার্মেন্টস শিল্পে ও বিভিন্ন শিল্প কারখানায় কাজ করে।

জেলে : বর্তমানে জেলায় প্রায় এক হাজার জেলে পরিবারের বসবাস। পূর্বের হিন্দু সম্প্রদায় ভিত্তিক জেলেদের পাশাপাশি বর্তমানে জীবন জীবিকার কারণে মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকেরাও মাছ বিক্রির পেশা বেছে নিয়েছেন। তারা বারো মাস মাছ শিকার করে বাজারে বিক্রি করে। এ ছাড়াও সুগন্দা, বিশখালীর মত বড় নদীসহ ছোট আকারের বাসণ্ডা, জাঙ্গালিয়া, গাবখান এ সকল নদীতে বাধা জাল, কারেন্ট জাল ও ইলিশ জাল পেতে মাছ শিকার করা প্রচুরসংখ্যক জেলে পরিবারও রয়েছে। বিশখালী নদীর ঝালকাঠী অংশে প্রায় ৪ শতাধিক জেলে পরিবার রয়েছে।

গ্রীষ্ম আসার সাথে সাথে প্রচুর পরিমাণ শ্রমিক মাছ ধরতে সমুদ্রে যায়। এরা বছরের মে মাস থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সমুদ্রে মাছ ধরে। আবার অনেক পরিবার অভ্যন্তরীণ নদী-নালা ও খালে সারা বছর মাছ ধরে। জেলার ৮৪০০০ কৃষি পরিবারে মধ্যে মোট ২২০০০ পরিবার মাছ ধরার সাথে সংশ্লিষ্ট। এদের মধ্যে ১৬,০০০ পরিবার ক্ষুদ্র কৃষিজীবী ও ৬, ০০০ পরিবার মধ্যম কৃষিজীবী।

অর্থনৈতিক অবস্থা

মাথাপিছু আয় (টাকা)	১২,৮৮৩
শিল্পে আয় (% মোট)	১৬%
স্থির দরে বার্ষিক মোট আয় বৃদ্ধি	৪.১%
বিদ্যুৎ সংযোজন সম্পন্ন খানা	২২%

জেলার মোট সক্রিয় জনশক্তি, মোট আয়, মাথাপিছু আয় এবং মাথাপিছু কৃষি জমির পরিমাণ সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থাকে নির্দেশ করে। ১৯৯৯-২০০০ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ঝালকাঠীতে সক্রিয় শ্রম জনশক্তির সংখ্যা ৬১৮ হাজার। এর মধ্যে ৫৭% পুরুষ এবং ৪৩% নারী। বিগত ১৯৯৫/৯৬ সালে জনশক্তি ছিল ৫৯৭ হাজার। এর মধ্যে পুরুষ ও নারী যথাক্রমে ৫৬%, ৪৪%। বর্তমানে জেলায় মাথাপিছু বার্ষিক গড় আয় ১২,৮৮৩ টাকা। মাথাপিছু জমির পরিমাণ ০.০৯ হেক্টর।

দরিদ্র	৩৮.৩%
অতি দরিদ্র	১৮.২%
ভুমিহীন	৫৫.৪%
ক্ষুদ্র কৃষক	৫৯.৮%

দারিদ্র্য : এ জেলায় অধিকাংশ লোক কৃষিনির্ভর। আর প্রধান ফসল হচ্ছে ধান। এ ছাড়াও রয়েছে কলা, পান, সবজি, ইক্ষু ইত্যাদি। কিন্তু এ সকল ফসলই প্রকৃতিনির্ভর তাই যখনই কোন দুর্যোগ আসে তখন এ সব ফসল নষ্ট হয়ে যায় এবং কৃষকরা পরে যায় দুরবস্থায়। আর এ ক্ষতির পরিমাণ ২-৩ বছরে কাটিয়ে উঠতে পারে না। ফলে বহু কৃষক দিন দিন দরিদ্রতার সীমানার মধ্যে চলে যায়। এ ছাড়াও নদী ভাঙনের ফলে ধীরে ধীরে বহু পরিবার নিরবে দরিদ্রতার মধ্যে প্রবেশ করছে।

ঝালকাঠী জেলার মোট জনসংখ্যার ৩৮.৩% দরিদ্র এবং ১৮.২% অতিদরিদ্র (বিবিএস/ইউনিসেফ)। এ ছাড়া জেলার মোট ৫৫.৪% ভূমিহীন এবং ৫৯.৮% ক্ষুদ্র কৃষক (বিবিএস-১৯৯৬)

নারীদের অবস্থান

অতি সম্প্রতি সিপিডি-ইউ.এন.এফ.পি.এ. বাংলাদেশের ৬৪ জেলার মোট জনসংখ্যা, সাক্ষরতার হার এবং অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় জনসংখ্যার বিচারে নারী-পুরুষের অসমতার একটি ধারাক্রম নির্ধারণ করে একটি লিঙ্গ সম্পর্কিত উন্নয়ন সূচক তৈরি করেছে। এতে দেখা যায় ঝালকাঠী জেলা "স্বল্পমাত্রার লিঙ্গীয় অসমতার" এলাকা। জেলার প্রতিকূল পরিবেশ, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, মূল্যবোধ, ধর্মীয় অনুশাসন আর দারিদ্র্য -এ সবই পরিবার ও সমাজে নারীর অবস্থান ও ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

লিঙ্গ অনুপাত : ঝালকাঠীর মোট জনসংখ্যার ৫০.৩% নারী। জেলার লিঙ্গ অনুপাত ৯৯:১০০। অপ্রাপ্ত বয়স্ক (০-১৪ বছর) লিঙ্গ অনুপাত ১০৭:১০০ এবং প্রজননক্ষম বয়স দলে (১৫-৪৯ বছর) লিঙ্গ অনুপাত ৮৬:১০০ (বি.বি.এস, ২০০৩)। জেলার নারীদের প্রজনন হার ২.২৭ (বি.বি.এস-ইউনিসেফ, ২০০১), অর্থাৎ একজন নারী তার জীবদ্দশায় গড়ে ২টি সন্তান জন্ম দেয়। জেলার নবজাতক মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৫২ জন, যা সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলের তুলনায় বেশি।

- **জেলায় লিঙ্গ অনুপাত ৯৯:১০০**
- **৫ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার ৮৭, যা জাতীয় হারের (৯২) তুলনায় বেশি।**
- **জেলার ৭ বছর$^{+}$ বয়সী নারী স্বাক্ষরতার হার ৬৫% এবং ১৫ বছর$^{+}$ বয়সী নারী স্বাক্ষরতার হার ৬৭%, যা উভয় ক্ষেত্রেই জাতীয় হারের (৪১) তুলনায় বেশি।**
- **মেয়েদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভর্তির হার ১০২, যা জাতীয় হারের তুলনায় বেশি।**
- **জেলায় কর্মরত নারী (১৫-৪৯) জনশক্তি ২৪.৫%, যা জাতীয় (২৮.২%) হারের তুলনায় কম।**
- **জেলায় নারীদের কর্ম-সুযোগ কম।**

বৈবাহিক অবস্থান : জেলার ৩১.৪৪% নারী বিবাহিত এবং ৪.২৬% নারী তালাকপ্রাপ্তা বা স্বামী পরিত্যক্তা (বি.বি.এস, ২০০১)। এখানে বিয়ে নিবন্ধনের হার ৮৮.৭% (বি.বি.এস-ইউনিসেফ, ২০০১)।

প্রজনন স্বাস্থ্য : পরিবার পরিকল্পনা তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (FPMIS-১৯৯৯)-এর তথ্য অনুসারে, জেলায় মাতৃমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৬.৩৩। জেলার মাতৃ মৃত্যুর হার নানা প্রপঞ্চ দ্বারা প্রভাবিত। খাদ্যের অসম বন্টন, ঝুঁকিপূর্ণ সন্তান জন্মদান, আধুনিক স্বাস্থ্য সেবার অভাব যেমন ডাক্তার, ক্লিনিক ও হাসপাতালের অভাব মায়েদের মুত্যুহারকে প্রভাবিত করে। জেলার ১৩-৪৯ বয়স দলের মোট ৩৫% নারী আধুনিক পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ করেছে, যা সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলে ৪১%।

শ্রম বিভাজন : নারী-পুরুষের কাজের ক্ষেত্রে ভিন্নতা রয়েছে। নারীদের ঘরের মধ্যে কাজ করার প্রবণতা বেশি। ঘরের বাইরে নারীরা প্রধানত পারিবারিক উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শ্রম দেয়। তবে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং দারিদ্র্যের কষাঘাতে দরিদ্রতম নারীরা ঘরের বাইরে নানা ধরনের কাজের সাথে যুক্ত হয়। বেঁচে থাকার তাগিদে তারা শহরাঞ্চলে কাজ নেয়।

সমাজে নারীর গতি-প্রকৃতি কিছু প্রপঞ্চের উপর নির্ভরশীল। তথাকথিত পর্দা প্রথা, অপ্রতুল যোগাযোগ ব্যবস্থা, ধর্মীয় অনুশাসন এ জেলার নারীদের গতিশীলতার প্রধান বাধা। তবে, নারীদের চলাচলের প্রকৃতি অনেকাংশেই সম্পদের সূচকের উপর নির্ভরশীল (কেয়ার, ২০০৩)। রাস্তা-ঘাটের ক্রম উন্নয়ন, ক্ষুদ্রঋণ সুবিধা, এনজিও-দের সচেতনতামূলক কার্যক্রম নারীদের বাইরের জগতের সাথে সম্পৃক্ত হতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

শ্রমশক্তি : ঝালকাঠীর নারীদের মধ্যে সক্রিয় শ্রমশক্তির হার ক্রমশ কমছে। গত ১৯৯৫-৯৬ সালে সক্রিয় শ্রম শক্তির অর্থাৎ ১৫ বছরের ঊর্ধ্বে জনগণের ৪৪% ছিল নারী। পরবর্তীতে ১৯৯৯-২০০০ সালে কমে গিয়ে হয়েছে ৪৩%। এ নারী শ্রম শক্তির মধ্যে ২৯% শহরের এবং ৪৫% গ্রামের। গ্রামীণ নারীরা প্রাকৃতিক দুর্বিপাকে পড়েই হোক আর দারিদ্র্যের কারণেই হোক, সেই চিরায়ত ধ্যান ধারণা ও পারিবারিক উৎপাদন পদ্ধতি থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে। গ্রামীণ কৃষিজীবী পরিবারের মধ্যে ২.৪৫% নারী পরের জমিতে শ্রম দেয় (বি.বি.এস.-১৯৯৬)। জেলার ১৫-৪৯ বছর বয়সী নারীদের মধ্যে মাত্র ২৫% অর্থ বা খাদ্যের বিনিময়ে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত, যা সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলে ২৬%।

স্বাস্থ্য পুষ্টি : ঝালকাঠীর নারীদের অতি অপুষ্টি, অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্য কাঠামো ও সেবা ব্যবস্থা নারীদের স্বাস্থ্য সার্বিকভাবে দুর্বল করেছে। জেলার মেয়ে শিশুদের মধ্যে অতি অপুষ্টির হার ১১%, যা জাতীয় হারের তুলনায় বেশি। পর্যাপ্ত নিরাপদ পানি ও পয়ঃসুবিধার অভাব তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। পর্যাপ্ত প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার অভাবে ৯৬.৭% নারীই ঘরে সন্তান জন্ম দিয়ে থাকেন। ৮১.৪% ক্ষেত্রে আত্মীয়-পরিজন, প্রতিবেশীরা সন্তান জন্ম নেয়ার সময় সহায়তা করেন, মাত্র ৬% নারী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাইদের সেবা পান। আধুনিক ডাক্তারদের সেবাপ্রাপ্ত নারীর সংখ্যা মাত্র ১২% (বি.বি.এস-ইউনিসেফ, ২০০১)।

শিক্ষা : জেলার ৭ বছর$^{+}$ বয়সী মেয়েদের মধ্যে সাক্ষরতার হার ৬৫% এবং প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের সাক্ষরতার হার ৬৭%। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ঝালকাঠীর মেয়েরা এগিয়ে আছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেয়ে শিশু ভর্তির হার ১০২ এবং মোট ছাত্রছাত্রীর (যাদের বয়স ৬ থেকে ১০ বছরের মধ্যে) ৫১% মেয়ে শিশু। একই চিত্র দেখা যায় স্কুল ও মাদ্রাসার ক্ষেত্রে। মাধ্যমিক স্কুলের মোট ছাত্রছাত্রীর ৫৩% ছাত্রী, মাদ্রাসার ক্ষেত্রে এই সংখ্যা ৪৮%। তবে কলেজগুলোতে ছাত্রী সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম (৪৪%) (ব্যানবেইস, ২০০৩)।

অবকাঠামো

রাস্তাঘাট

ঝালকাঠী জেলার ৭৫৯ কি.মি. পাকা রাস্তা রয়েছে। এর মধ্যে ১৩ কি.মি. আঞ্চলিক মহা সড়ক, ১৪৮ কি.মি. ফিডার রোড এ, ১০৮ কি.মি. ফিডার রোড বি, এবং ৭০ কি.মি, গ্রামীণ -১, ৪২০ কি.মি. গ্রামীণ-২ শ্রেণীর রাস্তা রয়েছে।

মোট পাকা রাস্তা	৭৫৯ কি.মি.
আঞ্চলিক মহা সড়ক	১৩ কি.মি.
ফিডার রোড–এ	১৪৮ কি.মি.
ফিডার রোড-বি	১০৮ কি.মি.
গ্রামীণ - ১	৭০ কি.মি.
গ্রামীণ - ২	৪২০ কি.মি.

নৌ-পথ

এ জেলায় ১১৫ কি.মি. নদী রয়েছে। এ ছাড়াও জেলায় ছোট ছোট খাল মিলিয়ে ১০০ কি.মি. স্থানীয় নৌ পথ রয়েছে। যেখানে জোয়ার-ভাটা হয় এবং নৌ চলাচল করে। নৌপথ একদিকে উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা আবার পরিবহন ও স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য খুবই জরুরী। জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করার জন্য তথা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য রাস্ত াঘাটেরও উন্নয়ন প্রয়োজন।

হাট-বাজার ও বন্দর

রাস্তা ঘাটের উন্নয়ন, মানুষের চাহিদা ও ভোগ্যপণ্য বিস্ত ারের কারণে জেলায় হাট বাজার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ জেলায় ৮৫টি হাটবাজার রয়েছে। জেলার বেশির ভাগ পণ্য পরিবহন হয় নৌপথে। নিম্ন আয়ের লোকেরা চলাচল করে নৌপথে আবার অনেক প্রত্যন্ত এলাকা আছে যেখানে নদীপথ ছাড়া উপায়ও থাকে না। তাই বেশিরভাগ লোক নৌপথ ব্যবহার করে। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য ও চলাচলের জন্য জেলায় বেশ কয়েকটি নদী বন্দর গড়ে উঠেছে। এ বন্দরগুলোতে আভ্যন্তরীণ নৌপথে চলাচল করা স্টীমার, বড় লঞ্চ, ছোট লঞ্চ এবং যন্ত্রচালিত নৌকায় লোক এবং মালামাল উঠানামা করে। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য, এ বন্দরগুলোকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে বড় হাট বাজার ও মোকাম। এ সকল বন্দরের সুযোগ সুবিধা আরো বাড়লে জেলা অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক হবে। এ জেলায় বাস স্টেশন রয়েছে এবং প্রতিদিন দূরপাল্লার বাস চলাচল করে।

বিদ্যুৎ/টেলিযোগাযোগ

বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এ পর্যন্ত ৩২৪৬০টি পরিবারকে বিদ্যুৎ পৌছে দিয়েছে। এর মধ্যে ১৩৪৮০ পরিবারকে শহরে এবং পল্লীতে ১৮৯৮০ পরিবারকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করেছে। এ জেলায় মোট ৪টি উপজেলা রয়েছে প্রত্যেকটির সাথেই ঢাকা বা অন্যান্য জায়গার টেলিফোনের যোগাযোগ রয়েছে।

ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র

জেলায় মোট ২৬ টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র রয়েছে (এল.জি.ই.ডি ২০০৪)। এ ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে জেলার ৮% লোক আশ্রয় নিতে পারে। এগুলো জনগণের জানমালের নিরাপত্তা দেয়, খাদ্যগুদাম হিসেবে ব্যবহার হয় এবং অন্য সময় স্কুল হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

শিল্পাঞ্চল

এ জেলায় ছোট ছোট শিল্প কারখানা বহু বছর পূর্ব থেকে গড়ে উঠেছে। এ জেলায় একসময় ৩১টি লবণ কারখানা ছিল। বর্তমানে ১৫টি লবণ কারখানা রয়েছে। এ ছাড়াও বেশ কিছু ছোট ছোট কারখানা বা কুটির শিল্প রয়েছে। যেমন পিতল ও কাঁশার তৈজসপত্র, শাঁখা শিল্প, গুড়ের কল, মৃতশিল্প, কর্মকার, তেলের কল ইত্যাদি। বর্তমানে এ সব কারখানা জেলা শহরে এবং আশপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তাই এ সকল শিল্প কারখানার জন্য ঝালকাঠীতে একটি শিল্প নগরী করার কার্যক্রম চলছে।

সেচ ও গুদাম

জেলার কৃষিজীবীরা আধুনিক ও ঐতিহ্যবাহী দুই ধরনেরই প্রযুক্তি ব্যবহার করে থাকে। এল.এল.পি দিয়ে জমিতে সেচ দেয়া হয় এবং পাওয়ার টিলার দিয়ে জমিতে চাষ দেয়া হয়। এ জেলায় ৬৩০ এল.এল.পি দিয়ে ৬১৫৪ হে. জমিতে সেচ দেয়া হয়। জেলায় ১৭টি খাদ্যগুদাম রয়েছে যার ধারণক্ষমতা মোট ৮৬৪০ মে. টন। ৬টি বীজ গুদাম রয়েছে যার ধারণ ক্ষমতা ২৭০ মে. টন এবং ১টি সার গুদাম (যার মোট ধারন ক্ষমতা ২৬০ মে. টন) রয়েছে।

গুদামের ধরণ	সংখ্যা	ধারণক্ষমতা (মে. টন)
খাদ্য গুদাম	১৭টি	৮৬৪০
বীজ গুদাম	৬টি	২৭০
সার গুদাম	১টি	২৬০

উন্নয়ন প্রকল্প

উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০০৪-২০০৫ অনুসারে ঝালকাঠী জেলায় সরকারি ৮টি সংস্থার মোট ১৩টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এখানে যে সকল প্রকল্প ২০০৪ সালের জুন মাসের পরেও চলমান সেগুলোর হিসাব তুলে ধরা হয়েছে। যে সব সরকারি সংস্থার মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে সে গুলো হচ্ছে, পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, কৃষি অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড ও পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড।

প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রকল্প সংখ্যা
পানি উন্নয়ন বোর্ড	১
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা	১
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	৩
মৎস্য অধিদপ্তর	১
কৃষি অধিদপ্তর	১
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	৩
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড	২
পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড	১

এ সকল প্রকল্পে যে সকল উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা সহযোগিতা করছে সেগুলোর মধ্যে ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন, বিশ্ব খাদ্য সংস্থা, নেদারল্যান্ডস সরকার, যুক্তরাজ্য সরকার, ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, ইউনিসেফ ইত্যাদি অন্যতম।

বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি জাতীয় এনজিও এ জেলায় কাজ করছে। যেমন BRAC, PROSIKA, CARITAS, ASA। ২০০১ সালের হিসাবে দেখা যায় যে, জাতীয় এনজিওগুলো ঝালকাঠী জেলার ২১% পরিবারের মধ্যে

৩০,৩৯৫টি ঋণ দিয়েছে। প্রতিটি ঋণ ৬,৩২০ টাকা করে মোট **১৯২.১** মিলিয়ন টাকা বিলি করা হয়েছে। স্থানীয় বেশ কিছু এনজিও ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প নিয়ে কাজ করছে।

হোটেল/অবকাশ কেন্দ্র : জেলা সদরে একটি সার্কিট হাউস ও একটি ডাকবাংলো রয়েছে। এ ছাড়া প্রতিটি উপজেলায় একটি করে ডাকবাংলো রয়েছে।

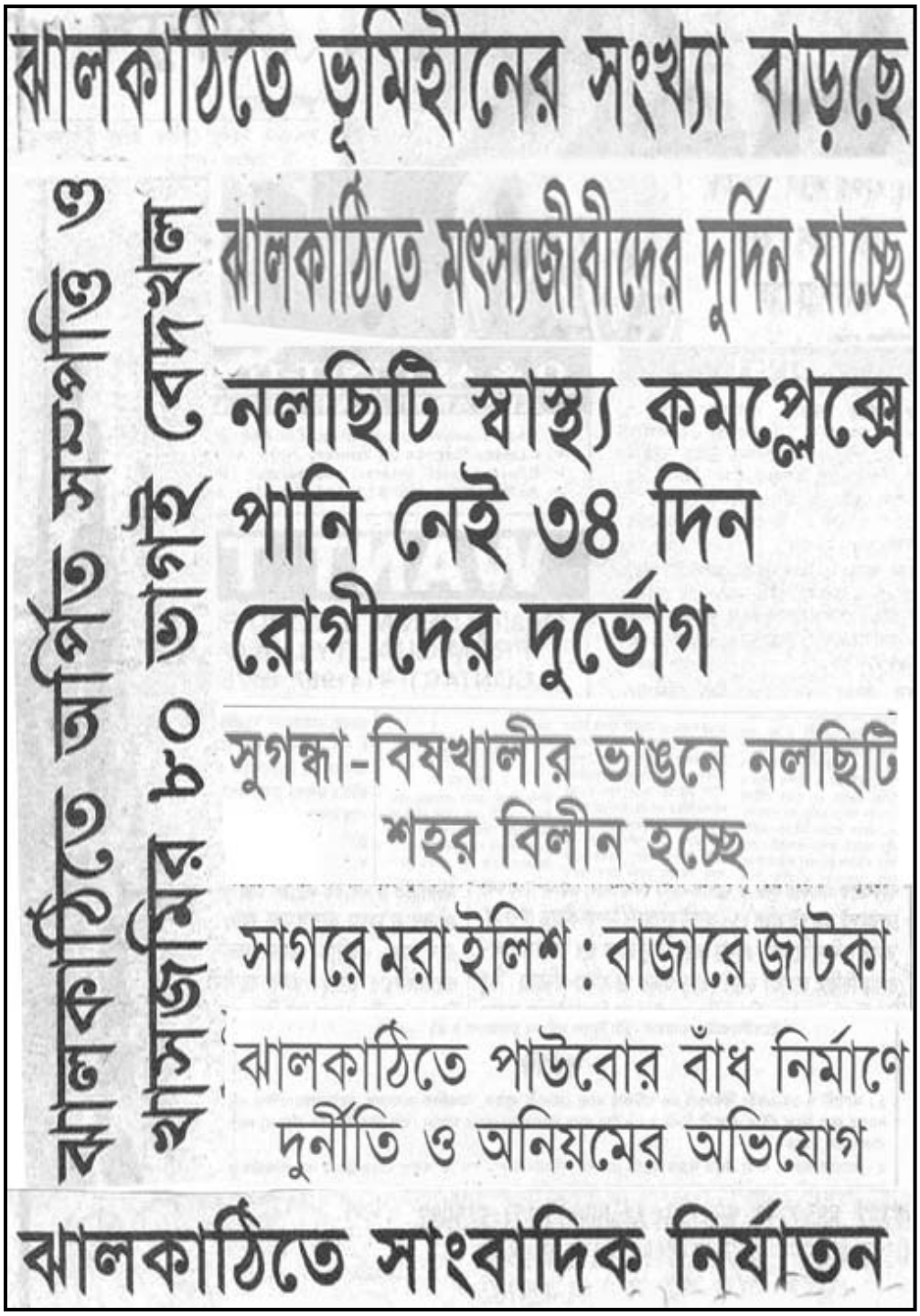

ঝালকাঠিতে ভূমিহীনের সংখ্যা বাড়ছে

ঝালকাঠিতে অর্পিত সম্পত্তি ও খাসজমির ৮০ ভাগই বেদখলে

ঝালকাঠিতে মৎস্যজীবীদের দুর্দিন যাচ্ছে

নলছিটি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পানি নেই ৩৪ দিন রোগীদের দুর্ভোগ

সুগন্ধা-বিষখালীর ভাঙনে নলছিটি শহর বিলীন হচ্ছে

সাগরে মরা ইলিশ : বাজারে জাটকা

ঝালকাঠিতে পাউবোর বাঁধ নির্মাণে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ

ঝালকাঠিতে সাংবাদিক নির্যাতন

সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা

ঝালকাঠী জেলার মানুষের জীবনে প্রাকৃতিক এবং মানুষের কারণে সৃষ্ট দুর্যোগ এবং প্রতিবন্ধকতার প্রভাব অপরিসীম। সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার এবং অসচেতনতার কারণে সামগ্রিক প্রতিবেশ ও পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে। এসব সমস্যার মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। (২০০৩ সালে এ জেলার বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজনের সাথে এ বিষয়ে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে, সমাজের মানুষের বিভিন্ন কার্যকলাপ, সম্পদের বন্টন বা ব্যবহার, উন্নয়ন পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়নের ফলে সৃষ্টি হওয়া কিছু প্রধান সমস্যার কথা আলোচিত হয়। এ ছাড়া মাঠ পর্যায়ের গবেষণা (২০০২, ২০০৩) ও আলোচনা (২০০৩) থেকে জেলার মানুষের সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতার যে চিত্র ফুটে উঠে, তার উল্লেখযোগ্য অংশ এখানে তুলে ধরা হল।

পরিবেশগত সমস্যা

ভরা জোয়ার : এ জেলায় বেশ কিছু নিম্নাঞ্চল রয়েছে। ফলে স্বাভাবিক জোয়ারে চর ও ফসলের জমিতে ৩-৪ ফুট পানি হয়। বর্ষা মৌসুমে অমাবস্যা-পূর্ণিমা'য় সমুদ্র উত্তাল হলে ভরা জোয়ার দেখা যায় । এর ফলে ফসলের প্রচুর ক্ষতি হয়।

পরিবেশগত সমস্যা
- ভরা জোয়ার
- জলাবদ্ধতা
- জীববৈচিত্র্য হ্রাস
- মাটি ও পানির লবণাক্ততা
- পরিবেশ দূষণ

আর্থ-সামাজিক সমস্যা
- কুটির শিল্প বিষয়ক সমস্যা
- কৃষি বিষয়ক সমস্যা
- ফলজ কৃষি বিষয়ক সমস্যা
- অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা
- বিপদাপন্নতা

শিল্প বিষয়ক সমস্যা

জলাবদ্ধতা : এ জেলায় গ্রাম-গঞ্জের ছোট ছোট খালগুলোর মুখ পলি পরে জমির চেয়ে উঁচু হয়ে গিয়েছে। যার ফলে ভরা জোয়ারে পানি উঠলে আর নামতে পারে না। আবার অতি বৃষ্টি হলেও জমিতে পানি জমে যায় ফলে ফসলের ক্ষতি হয়। গ্রামে অপরিকল্পিত রাস্তাঘাট নির্মাণও জলাবদ্ধতার একটি অন্যতম কারণ।

জীব বৈচিত্র্য হ্রাস : এ জেলার কিছু মাছ ছিল যা মিঠা পানি এবং লবণ পানি উভয়ের মধ্যে পাওয়া যেত যেমন- তাপসী, পোয়া, গুলসা ট্যাংরা, চাপিলা ও ইলিশ ইত্যাদি। এসব মাছও দিন দিন কমে যাচ্ছে। বহু প্রজাতির মাছ একেবারেই বিলীন হয়ে গেছে।

মাটি ও পানির লবণাক্ততা : নদী প্রবাহ কমে যাওয়া, নদীর ভাঙন, নদীর তলদেশ ভরাট এবং সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে সমুদ্রের পানি নদীর অনেক উজানে এবং জমিতেও প্রবেশ করছে। ফলে জমি তার উর্বরতা হারাচ্ছে খুবই দ্রুতহারে। নদীতে লবণাক্ত পানি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পরিবেশ দূষণ : জেলার শিল্প কারখানা ও শহরের বর্জ্য স্থানীয় পরিবেশকে বেশ দূষিত করছে। এ জেলা শহরের নদীর তীরে বেশ কিছু লবণ কারখানা, এ্যালুমিনিয়াম, কাঁসা-পিতলের কারখানা রয়েছে। এ সকল কারখানা প্রচুর রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে এবং সৃষ্ট বর্জ্য স্থানীয় নদীতে ফেলা হয়। একই সাথে শহরের বর্জ্য পদার্থও নদীর পানিতে মিশে যাচ্ছে। ফলে নদীর পানি এবং স্থানীয় পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। এই পানি যেমন মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ছে একই সাথে ফসলের জমি এবং ফসলেরও ক্ষতি করছে।

আর্থ-সামাজিক সমস্যা

কুটির শিল্প : ঝালকাঠী জেলা এক সময় বৃহৎ বরিশাল জেলার প্রধান বাণিজ্য বন্দর ছিল। সেই কারণেই এখানে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্র কুঠির শিল্প। যেমন তাঁত, মৃৎ শিল্প, স্বর্ণকার, কাশারু, শাঁখা, পাপোষ, লবণ শিল্প ও বিড়ি ইত্যাদি। বর্তমানে এ সব শিল্প কারখানা খুবই দুরবস্থার মধ্যে আছে। আধুনিকায়ন এবং বড় শহরভিত্তিক শিল্প

কারখানা গড়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ায় এ সব শিল্প কারখানার শ্রমিকরা বেকার হয়ে পড়ছে এবং তারা অর্থের অভাব ও সামাজিক নিরাপত্তার অভাবে পেশা পরিবর্তন করছে।

কৃষি বিষয়ক সমস্যা : জেলার কৃষি ব্যবস্থা সম্পূর্ণ স্থানীয়ভাবে গড়ে উঠা সনাতনী পদ্ধতির। এ জেলার কৃষি ব্যবস্থার প্রধান সমস্যাগুলোর মধ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, পঙ্গপালের (পামুরী) আক্রমণ, উন্নত ও আধুনিক সুযোগ-সুবিধা ও দুর্যোগ থেকে ফসল রক্ষা করার জ্ঞানের অভাব। আবার রোপা আমন, আউস, বোরো ধানে প্রায় প্রতি বছরই বিভিন্ন রকমের পোকা (পামুরী) লাগে। এ পোকা-মাকড় ফসল ধ্বংস করে ফেলে। জেলার ফসল রক্ষাকারী বাঁধের রক্ষণাবেক্ষণের অভাব রয়েছে। ফলে একটু ঝড় বা জলোচ্ছ্বাসে বাঁধ ভেঙ্গে যায় এবং কৃষি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ ছাড়া, বাঁধের মধ্যে মিঠা পানি সংরক্ষণের অভাবে কৃষিকার্য ব্যাহত হয়। ঝালকাঠী জেলায় কৃষকদের প্রতিবছর উন্নত জাতের বীজ সরবরাহেরও অভাব রয়েছে।

ফলজ কৃষি : জেলায় বেশ কিছু ফলজ কৃষি চাষ হয় যেমন, কলা, আমড়া, নারিকেল, সুপারি ও পান। এসকল সম্পদ ঠিকভাবে বাজারজাত না করা বা সংরক্ষণের অভাবে কৃষকরা হতাশ হচ্ছে। এ ছাড়া মধ্যস্বত্বভোগীদের কারণে কৃষকরা প্রকৃত মূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। প্রকৃত মূল্যের এক বিরাট অংশ এ ফড়িয়া বা আড়তদাররা নিয়ে নেয়। এ ছাড়া পেয়ারা, আমড়া, কলা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে ফলন কম হচ্ছে। এখানে কৃষকরা সু-পরামর্শ থেকে বঞ্চিত।

খাল-বিল সংরক্ষণ ও সংস্কার : জেলায় প্রচুর খাল-বিল ও নালা রয়েছে। এ সকল খাল-বিল ও নালায় জোয়ারের জন্য প্রতিনিয়ত পলি জমে। এ ছাড়াও বিভিন্ন সময় বন্যা ও জলোচ্ছ্বাসের ফলেও পলি জমে। এ পলির ফলে খাল-বিল ও নালাগুলোর সাথে নদীর সংযোগ স্থল উঁচু হয়ে যাচ্ছে। ফলে ফসলী জমির পানি নদীতে নামতে পারে না এবং ফসল নষ্ট করে ফেলে।

অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা : একসময় পূর্ববঙ্গের কিংবদন্তীর মত ছিল বরিশাল। আর এ ঝালকাঠী ছিল তার বিশিষ্ট স্থান ও বাণিজ্য কেন্দ্র। বর্তমানেও বৃহত্তর বরিশালের প্রধান পাইকারী ব্যবসা কেন্দ্র এ ঝালকাঠী। তাই এ জেলার সাথে আশপাশের জেলাগুলোর সাথে যোগযোগ ব্যস্থার উন্নয়ন দরকার। যদিও জেলার উপর দিয়ে একটি আঞ্চলিক সড়ক চলে গেছে তথাপি জেলার বেশিরভাগ লোক বা মালামাল পরিবহনের একমাত্র পথ হচ্ছে নৌ-পথ। দ্রুত পৌছানোর জন্য কোন আধুনিক স্টিমার বা লঞ্চ নাই। উপজেলাগুলোর হাট-বাজারের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা সড়ক পথে নেই বললেই চলে। এর ফলে জেলার কৃষক বা ব্যবসায়ীদের কোন মালামাল বা পণ্য বাজারজাত করা খুবই সময় সাপেক্ষ এবং ব্যয়বহুল। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়।

বিপদাপন্নতা : সীমিত সম্পদ বা জমি, অনুন্নত কৃষি যন্ত্রপাতি, দ্বন্দ-সংঘাত, অর্থের অভাব ইত্যাদি প্রধান কয়টি জীবিকা দলের আর্থ-সামাজিক বিপদাপন্নতার কারণ। জেলেদের দৈন্যদশার কারণ হল দুর্বল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, জলদস্যু, জেলেদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়া, অর্থাভাব, মহাজনী বা দাদন ব্যবসা ইত্যাদি। গ্রামীণ শ্রমিকদের জীবিকা নির্বাহের অন্যতম অন্তরায় হচ্ছে তাদের কাজের অভাব, মজুরী শোষণ, ভগ্ন বা রুগ্নস্বাস্থ্য, অর্থাভাব, পানি ও পয়ঃসুবিধার অভাব, আয়ের উৎস কমে যাওয়া ইত্যাদি। বসবাসের জায়গার অভাবসহ কাজের অভাব, জলাবদ্ধতা, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, শহরের দিনমজুর বা শ্রমিকদের জীবনকে সংকটাপন্ন করে তোলে।

শিল্প বিষয়ক সমস্যা

ঝালকাঠী জেলায় শিল্প কারখানা গড়ে উঠে প্রায় তিন শত বছর পূর্ব থেকে। এক সময় এ ঝালকাঠীতে বিভিন্ন শিল্প কারখানা ছিল। যেমন তুলা, তাঁত, কাশারু, নৌকা শিল্প, গুঁড়, শীতল পাটি, তেলের কল, চটের ব্যাগ, কাগজ, শাঁখা, ছোবরার কার্পেট, লবণ ও বিড়ি ইত্যাদি। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণে বহু শিল্প বিলীন হয়ে

গিয়েছে। বর্তমানে সময়ের সাথে তাল মিলাতে না পারায় এবং শিল্প কারখানার মালিকদের বড় শহরের দিকে মিল কারখানা গড়ার জন্য ঝালকাঠীর অনেক শিল্প বিলীন হয়ে গেছে এবং বর্তমানে অনেক শিল্প রুগ্নতার শিকার হয়েছে। যেমন -

লবণ শিল্পের সমস্যা : ১৯৭৮ সালের হিসাবে দেখা যায় জেলায় মোট ৩১টি লবণ তৈরির কল ছিল। কিন্তু বর্তমানে চালু রয়েছে ১৫টি। বাকিগুলো অবলুপ্ত প্রায়। এর প্রধান কারনগুলো হলো-

চাহিদা কমে যাওয়া : ঝালকাঠী থেকে পূর্বে খুলনা, পিরোজপুর গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর ও বৃহত্তর বরিশালের সব এলাকায় লবণ যেত। বর্তমানে খুলনা, পিরোজপুর ও ভোলায় লবণ ফ্যাক্টরী হওয়ার ফলে ঝালকাঠীর লবণের চাহিদা কমে গেছে।

আয়োডিন মিশান যন্ত্রের সমস্যা : আয়োডিন মিশান যে যন্ত্র সরকার দিয়েছে তা সহজেই মরিচা ধরে যায়, ফলে লবণের রং সাদা না হয়ে কিছুটা ঘোলা হয়ে যায়। ফলে লবণের ক্রেতা কম হয়।

বিজ্ঞাপণ প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়া : রেডিও, টিভি ও সংবাদপত্রে চটকদার বিজ্ঞাপণ দিয়ে অন্যান্য এলাকার লবণ বাজার দখল করে নিতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু ঝালকাঠীর লবণ কল মালিকরা কোন বিজ্ঞাপণ দেন না। ফলে ক্রেতাদের ঝালকাঠীর লবণের প্রতি আকর্ষন কম। আর্থিক সমস্যার জন্যই এটা হচ্ছে বলে তাদের বক্তব্য।

ব্যাংক ঋণের জটিলতা : সরকারি সহযোগিতা, উৎসাহ এবং ব্যাংক ঋণের সুবিধা খুবই জটিল এবং কম। ফলে লবণ শিল্প মালিকরা পুঁজি সংকটে ভুগছে, যা লবণ শিল্পের জন্য কাম্য নয়।

প্রশিক্ষণের অভাব : প্রাচীনকালে প্রথম যাঁতায়, পরে মেশিনে লবণ প্রস্তুত হলেও লবণ শ্রমিকদের কোন সময় প্রশিক্ষণ দেয়া হয়নি বা দেয়া হচ্ছে না, যা উন্নত বিশ্বে করা হয়ে থাকে। কেবলমাত্র বিসিক থেকে মালিকদের আয়োডিনের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। তাই শ্রমিকরা যেহেতু লবণ তৈরিতে সরাসরি সম্পৃক্ত তাই তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া দরকার।

সুষ্ঠু নীতিমালার অভাব : দেশীয় লবণের সর্বোচ্চ উৎপাদন বাজারজাত, বিক্রি এসব বিষয়ে সরকারের কোন সুষ্ঠু নীতিমালা প্রণীত হয়নি যা লবণ শিল্পে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে।

এ ছাড়াও অন্য কিছু সমস্যাও রয়েছে। যেমন নিম্নমানের ক্রুড লবণ, কম বিক্রয় মূল্য, রাজনৈতিক প্রভাব, শ্রমিক সমস্যা, প্রকৃত মূল্য না দেয়া ইত্যাদি।

তাঁত শিল্পের সমস্যা : এক সময় ঝালকাঠীতে প্রায় ৫ হাজার পরিবার তাঁত শিল্পের সাথে জড়িত ছিল। অবিভক্ত বাংলায় এক সময় ঝালকাঠীর গামছা, লুঙ্গী, শাড়ী খুবই বিখ্যাত ছিল। ঝালকাঠী বন্দরে একসময় এ তাঁতিদের কাপড় বিক্রি হত এবং তার নামানুসারে কাপুড়া পট্টি বলা হত। সময়ের সাথে সাথে এ তাঁত শিল্পের অনেক দুরবস্থা দেখা দিয়েছে। যুগের সাথে বা আধুনিকতার সাথে তাল মিলাতে না পারায় তাঁতীরা অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণে পেশা পরিবর্তন করছে। এখনও জেলার বিভিন্ন গ্রাম জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। বর্তমানে জেলায় এক হাজার তাঁতী পরিবার রয়েছে, যারা এখনও গামছা, লুঙ্গী ও শাড়ী তৈরি করে। পশ্চিম ঝালকাঠী, মানপাশা, বাউকাঠি, আমুয়া, আওড়াবুনিয়ায় এদের বসবাস রয়েছে।

শীতল পাটি : এ জেলার হাইলাকাঠি, ডহরশংকর, নলছিটির মানপাশাসহ কিছু নিচু এলাকায় পাইত্রা বা মুর্তা নামক কাণ্ড বিশিষ্ট গাছ জন্মে এবং এ গাছকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এ জেলার রমরমা পাটি শিল্প। এ জেলার শীতল পাটির এখনো কদর রয়েছে। এ জেলা থেকে প্রচুর পাটি দেশের অন্যত্র যায়। প্রায় ৩০০ পরিবার এ শিল্পের উপর নিভরশীল। বর্তমানে এর কাঁচামালের অভাব তাই এ সব পরিবার খুবই অসুবিধায় আছে।

ঝালকাঠীতে মৎস্যজীবীদের টেকে রাখার সংগ্রাম

Women in informal job sectors

কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প চার বছরের জন্য আয়করমুক্ত

Govt-NGO cooperation needed to ensure safe drinking water

A big boost to shrimps in sight

Higher yield with new technology under ATDP, virus-free fry inspire fresh hope among Satkhira shrimp cultivators

ইউরোপে সবজির বাজার পেতে পারে বাংলাদেশ

'NGOs should do more for poverty alleviation'

সম্ভাবনা ও সুযোগ

কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারখানা ও শিক্ষার বিপুল সম্ভাবনাময় জেলা ঝালকাঠী। জেলা ও মাঠ পর্যায় বিভিন্ন স্তরের মানুষের সাথে আলাপ আলোচনা ও মত বিনিময়ের মাধ্যমে জেলার প্রধান সম্ভাবনাময় দিকগুলোর স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য শিল্প-কারখানা, মৎস্য সম্পদ, অবকাঠামো উন্নয়ন, আধুনিকায়ন করা এবং ঝালকাঠীর পুরোনো ঐতিহ্যবাহী কুটির শিল্প সংরক্ষণ করা গেলে জেলার অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা সম্ভব।

এ ছাড়া প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ, প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী স্থান সংরক্ষণ ও শিক্ষার আরো উন্নত সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা গেলেই এ জেলার উন্নয়নের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে।

কৃষি ও অর্থনীতি

ঝালকাঠী জেলা সম্পূর্ণভাবে কৃষিনির্ভর। এ জেলার মূল ফসল ধান। যে কারণে জেলার বেশিরভাগ পরিবার কৃষিনির্ভর এবং জেলার অর্থনীতিও কৃষিনির্ভর। তাই কৃষিকে উন্নত ও নিরাপদ করতে পারলেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব। কৃষিকে উন্নত করতে হলে কৃষকদের স্থানীয়ভাবে প্রযোজ্য আধুনিক চাষাবাদ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। সেই সাথে কৃষকদের উন্নতমানের স্থানীয় ধান ও অন্যান্য ফসলের বীজ সরবরাহ করতে হবে। বীজ হতে হবে সময় উপযোগী এবং প্রকৃতিনির্ভর, এ জেলার আবহাওয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। একই সাথে ফসল রক্ষণাবেক্ষণ, সংরক্ষণের সুব্যবস্থা এবং প্রকৃত মূল্যের নিশ্চয়তা বিধান করতে পারলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব।

সুযোগ ও সম্ভাবনা
কৃষি ও অর্থনীতি
কৃষি ভিত্তিক ক্ষুদ্র শিল্প
মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা
চিংড়ি চাষ
শুটকি মাছ
পর্যটন শিল্প
উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা
নৌ
রাস্তা ঘাট
বিমান বন্দর সংস্কারকরণ
খালবিল সংরক্ষন ও সংস্কার
ব্যক্তিগত খাত
ভূমি ব্যবহার
প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষন
বনজ সম্পদ
ব্যবসা-বাণিজ্য
শিল্পাঞ্চল

এ জেলার সব উপজেলাগুলোতেই প্রচুর রবি শস্যের চাষ হয়। যেমন বিভিন্ন রকমের ডাল, তেলবীজ, আলু, শাক-সবজি, মরিচ ইত্যাদি। এ সকল ফসলের সংরক্ষণ করার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করলে কৃষকরা প্রকৃত মূল্যে বিক্রি করতে পারবে।

ঝালকাঠী জেলার কৃষকদের একটি মূল সমস্যা প্রাকৃতিক দুর্যোগ। আর এ দুর্যোগ থেকে কৃষকদের জমির ফসল এমন কি ঘরের ফসল ও বীজ রক্ষা করা অনেকটা অনিশ্চিত। কারণ সাইক্লোন এবং জলোচ্ছ্বাস মে মাস থেকে নভেম্বরের যে কোন সময় হতে পারে। তাই এ দুর্যোগ থেকে কৃষকদের সম্পদ রক্ষার নিশ্চয়তা বিধান করতে পারলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

স্থানীয় জনগণ এবং সরকারিভাবে যৌথভূমি ব্যবহার পদ্ধতি থাকলে চাষাবাদে সুবিধা হয়, কারণ পরিকল্পনামাফিক জমি ব্যবহার করলে জমির সম্পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়; সেই সাথে জমির উর্বরতাও রক্ষা হয়।

কৃষিভিত্তিক ক্ষুদ্র শিল্প : এখানে কৃষিভিত্তিক শিল্পের সম্ভাবনা প্রচুর। যেমন নারিকেলের ছোবরা দিয়ে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারিক অনেক কিছু তৈরি হয়। তারপর কাঠ শিল্প, মৃতশিল্প, কামার, শীতল পাটি, কাশারী, কুমার, চুনারী এসবের বেশ সম্ভাবনা আছে। এ ছাড়াও এ জেলায় বেশ কয়েকটি মৌসুমী ফল জন্মায়। যেমন আমড়া পেয়ারা অন্যান্য মৌসুমী ফল টিনজাত করে দেশে এবং বিদেশে বাজারজাত করা যায়।

এ ছাড়াও রয়েছে শীতকালীন শাক-সবজি, যা বাংলাদেশের বিভিন্ন বাজারে বাজারজাত করা হয়। সংরক্ষণ এবং বাজারজাতকরণের আধুনিক ও দ্রুত ব্যবস্থা এ শিল্পের বিকাশে সহায়তা করবে।

মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা : এ জেলায় একসময় নদী, খাল-বিল, জলাশয় মৎস্য সম্পদে ভরপুর ছিল। পুকুর ও জলাশয় ছিল শিং, কই, মাগুর, রুই, কাতল, মৃগেল, কালিবাউশসহ বিভিন্ন জাতের মিঠাপানির ছোট মাছের ভাণ্ডার। একই সাথে নদীর বা সমুদ্র উপকূলেও প্রচুর মাছ পাওয়া যেত, যেমন ইলিশ, কোরাল, ভেটকি, ভোল মাছ, পোয়া, তুলার ডাটি, তাপসী ইত্যাদি। কিন্তু বর্তমানে এ সব মাছ খুবই কম পাওয়া যায়। মৎস্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন করে মৎস্যসম্পদ বৃদ্ধি সম্ভব।

ব্যবসা-বাণিজ্য : জেলার পুরান স্টীমার ঘাটটি আরো উন্নত করা এবং মালামাল রাখার গোডাউন, বিদ্যুতায়ন, ও ব্যবসায়ীদের অস্থায়ীভাবে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারলে ব্যবসায়ীরা উৎসাহিত হবে। তাহলে পুরান ঐতিহ্য ফিরে পাবে এবং অর্থনৈতিক উন্নতি হবে। এ ছাড়াও এ জেলার উৎপাদিত পণ্য যাতে অতি সহজে দেশের বাজারে এবং যোগ্যতাসম্পন্ন পণ্য বিদেশে পাঠানো নিশ্চিত করতে পারলে জেলার ব্যবসা-বাণিজ্যের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে।

উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা : এ জেলার যোগযোগ ব্যবস্থা খুব একটা ভাল নয়। ইদানীং জেলা শহরের সাথে ঢাকা বা অন্যান্য শহরের কিছুটা যোগাযোগ সহজ হয়েছে, কিন্তু গ্রাম, হাট-বাজার অঞ্চলের সাথে যোগাযোগ অপ্রতুল। তাদের একমাত্র যোগাযোগের ব্যবস্থা নৌপথ। তাই জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হলে অর্থনৈতিক দিক আরও সমৃদ্ধ হবে।

শিল্প

ঝালকাঠী জেলা মোঘল সম্রাটদের যুগ থেকে ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রসিদ্ধ ছিল। একই সাথে গড়ে উঠল লবণ শিল্প কারখানা। পরবর্তীতে এ জেলার বৃটিশ ভারতের সময় গড়ে উঠে তৈজসপত্র, গুড়, তেলসহ বিভিন্ন শিল্প। বর্তমানে এ জেলায় ১৫টি লবণ কারখানা চালু। ১৯৭৮ সালের হিসাবে এ জেলায় ৩১টি লবণের কারখানা চালু ছিল। প্রতিটি কারখানায় সব মিলিয়ে একশত লোক কাজ করত। বর্তমানে জেলার আশপাশে (ভোলা, পিরোজপুর, খুলনা) বিভিন্ন জায়গায় লবণ কারখানা হওয়ায় চাহিদা কমে গেছে। নিম্নলিখিত বিষয়গুলোকে বিবেচনায় রেখে যদি সামনে এগোনো যায় তাহলে এ শিল্পের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন-

- সহজ শর্তে ও কোনরূপ বাড়তি ঝামেলা ছাড়া লবণ চাষী, লবণ শ্রমিক ও মিল মালিকদের ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা।
- ব্যাংকের পাশাপাশি স্থানীয় এনজিওগুলোতে লবণ ঋণ চালু করা।
- লবণ উৎপাদনের প্রতিটি স্তরে পরিশ্রম, খরচ ইত্যাদি বিবেচনা করে সকল ধরনের লবণের মূল্য নির্ধারণ।
- বিদেশী লবণ আমদানি নিষিদ্ধ করা, লবণের চোরাচালান রোধে 'বিশেষ অবজারভেশন সেল' গঠন করা।
- লবণ পরিবহনের ক্ষেত্রে নৌ ডাকাতি ও চাঁদাবাজি রোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- আয়োডিন মেশানো যন্ত্রগুলোর সমস্যা চিহ্নিত করে বিকল্প যন্ত্র মিল মালিকদের সররাহ করা।
- মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য থেকে মিলগুলোকে রক্ষার জন্য সরকারি উদ্যোগে জমি থেকে লবণ কিনে সরাসরি মিলে সরবরাহ করা।
- সকল ফ্যাক্টরীর লবণের বিজ্ঞাপন গণমাধ্যমে প্রচারের জন্য মালিকদের উদ্যোগ গ্রহণ।
- লবণ চাষী, শ্রমিক এবং মিল মালিকদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

বনজ ও ফলজ বিষয়ক ব্যবসা-বাণিজ্য : জেলায় কৃষি বনজ ও ফলজ বিষয়ক ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। ঐ সকল কেন্দ্রগুলোকে আধুনিক করা এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো যেমন গোডাউন, বিদ্যুতায়ন, জেটি নির্মাণ এবং অন্যান্য সুবিধা বৃদ্ধি করলে ব্যবসায়ীরা উৎসাহিত হবে এবং স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নতি হবে। সেই সাথে ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তা বিধান করতে হবে এবং অতি সহজে দেশের বাজারে, স্থানীয় পণ্য পৌছানো নিশ্চিত করতে

পারলে এ জেলার বাণিজ্যের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে পাইকারী ক্রেতাদের নিরাপত্তা বিধান করা প্রয়োজন।

ব্যক্তিখাত : জেলার ব্যক্তি খাতকে উৎসাহিত করা দরকার। জেলায় গত ২০ বছরে ব্যক্তি খাতে অনেক ক্ষুদ্র শিল্প, কুটির শিল্প এবং বেশ কয়েকটি বরফকল গড়ে উঠেছে। এ ছাড়াও বহু বছর পূর্ব থেকে চাল ভাঙ্গার কল, স-মিল ব্যক্তিগত উদ্যোগে গড়ে উঠেছে। এ সব ক্ষেত্রে আধুনিক যন্ত্রপাতিসহ আর্থিক সহযোগিতা করলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব।

প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ

জেলার বিভিন্ন এলাকায় বেশ কিছু প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে বিভিন্ন রকমের গাছ পালা যেমন নল বন, হোগলা বন, কেওরা বন এবং বিভিন্ন রকমের গাছ প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করে। এ সকল প্রাকৃতিক সম্পদ সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সংরক্ষণ করা গেলে জেলার ফসল, সম্পদ, নদী-নালা ও ভূমি রক্ষা পাবে।

বনজ সম্পদ : জেলায় বিভিন্ন উপজেলার চরে প্রাকৃতিক বন ছাড়া সরকারি সৃজিত বাগান, অশ্রেণীভুক্ত বন, গ্রামীণ বনজ-বাগান মিলিয়ে বনাঞ্চলের পরিমাণ অত্যন্ত সন্তোষজনক এবং এখনও নদীর তীরে নল বন ও কেওরা বন রয়েছে, যা সংরক্ষণ করলে নদীর ভাঙন কমবে।

ভবিষ্যতের রূপরেখা

	২০১৫	২০৫০
মোট লোকসংখ্যা (লাখ)	৭.৩৬	৯.০৮
পুরুষ	৩.৭৫	৪.৫৪
নারী	৩.৬১	৪.৫৪
গ্রামীণ জনসংখ্যা	৫.৬০	৫.০০
শহুরে জনসংখ্যা	১.৭৭	৪.০৭

বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল বাস্তবায়নের শেষ বছর ২০১৫ সাল। এ সালে ঝালকাঠী জেলায় জনসংখ্যা ৬.৯২ লাখ (২০০১) থেকে বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৭.৩৬ লাখ হতে পারে। এ বিপুল জনগোষ্ঠীর এবং জেলার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মসংস্থানের নানান পথ তৈরি করতে হবে। জেলার উন্নয়নে যে সমস্ত সম্ভাবনাকে কাজে লাগান যায় তা হল, কৃষিভিত্তিক ক্ষুদ্র শিল্প, কুটির শিল্প, উন্নত কৃষি ব্যবস্থা, চিংড়ি চাষ, উন্নতমানের হাঁস-মুরগির খামার, মাছ চাষ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি। সেই সাথে যে সমস্ত বিষয়ে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে তা হল বাণিজ্যে প্রসার, প্রত্যন্ত অঞ্চলে ও হাট বাজারের অবকাঠামোগত উন্নয়ন।

জেলার বাণিজ্যিক ভিত্তিতে একটি বিশেষ সুবিধা রয়েছে। পাশের জেলাগুলোর (বরিশাল, পিরোজপুর, বরগুনা, পটুয়াখালী ও বাগেরহাটের অংশ বিশেষ) কৃষিজাত দ্রব্যের মূল মোকামগুলো এ জেলায় অবস্থিত। ফলে উল্লিখিত জেলার ধান চাল নারিকেল সুপারি কলা ও হাঁস-মুরগির পাইকারি বেচা-কেনা হয় এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় সরবরাহ করা হয়। জেলার ঐ সকল বিখ্যাত হাট-বাজার ও মোকামগুলোর আরো কাঠামোগত উন্নতি হওয়া দরকার। বিশেষ করে গোডাউন, রাস্তাঘাট, নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা অতি জরুরী। তাহলে এ জেলায় হাট-বাজারগুলো আরো বড় আকারে বসবে এবং বিক্রেতা ও ক্রেতাদের আকর্ষণ করবে। এ সকল বিষয়ে স্থানীয় বাণিজ্যকেন্দ্রগুলো যেমন আমুরা, কাঠালিয়া, বাদুরতলা, নলছিটি, আওরাবুনিয়া, বাউকাঠী ও জালকাঠী বন্দর মোকামগুলো ঝালকাঠী ইত্যাদি মোকামগুলোতে কাঠামোগত উন্নয়ন সাধন করলে স্থানীয়ভাবে উন্নয়ন সম্ভব।

দর্শনীয় স্থান ও খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব

কীর্তি পাশা জমিদার বাড়ি : রায়ের কাঠীর দেওয়ান এ জমিদার বাড়ীর প্রতিষ্ঠাতা।। এই বংশেরই প্রসন্ন কুমার ১৮৬৩ সালে একটি ইংরেজী উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বিখ্যাত সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক রোহিনী কুমার রায় চৌধুরী এ বাড়ির সন্তান। বর্তমানে এ বাড়ির পূর্ব ইশা ও পশ্চিম ইশার ধ্বংসাবশেষ আছে। এখানে একটি বড় শিব মন্দির রয়েছে।

সাতুরিয়া জমিদার বাড়ি : সেলিবাদ পরগনার তালুকের মধ্যে কীর্তিপাশা ও সাতুরিয়া অন্যতম ছিল। বর্তমানে এ বাড়ির ইমারতগুলো রয়েছে এবং কিছু ধ্বংস হয়ে গেছে। শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের নানা বাড়ি এ সাতুরিয়া মিয়া বাড়ি। তিনি ১৮৭০ সালে এ বাড়িতেই জন্ম গ্রহণ করেন।

বাসণ্ডার জমিদার বাড়ি : বাসণ্ডার জমিদার মহলানবিশ বরিশালের বৈদ্য জমিদারদের অন্যতম ছিলেন। তার মেয়ের সাথে কীর্তিপাশার জমিদার রাজ সেনের বিয়ে হয়। বিখ্যাত সাহিত্যিক চণ্ডীচরণ সেন এ বংশে জন্মগ্রহণ করেন।

কুলকাঠী জামে মসজিদ : ১৯২৬ সালে এ মসজিদটি তৈরি হয়। এ মসজিদ ঘিরে রয়েছে বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা। এর কাছে ছিল একটি মন্দির। আর সেখানে প্রতি বছর মেলা বসত। হিন্দুরা ঢোলবাদ্য বাজিয়ে যেত বলে মুসলমানদের সাথে বিরোধ হয়। শান্তিভঙ্গের আশংকায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ই. এন বোলান্ডি, পুলিশ সুপার মি: টেলর কুলকাঠীতে আসেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য ইমামকে গ্রেপ্তার করা হয়। ফলে মুসলমান মুসল্লিরা পুলিশকে বর্শা ও তীর নিক্ষেপ করে। পুলিশের পাল্টা গুলিতে ১৯ জন মুসলমান নিহত হন। তৎকালীন বৃটিশ ভারতে পত্রিকাগুলোতে এ সংবাদ ফলাও করে পরিবেশন করা হয়। চঞ্চল হয়ে উঠে উপমহাদেশ। ঐ সব শহীদদের এ মসজিদের পাশেই দাফন করা হয়।

সুরি চোরা জামে মসজিদ : এ মসজিদটি রাজাপুর উপজেলার মঠবাড়ি ইউনিয়নের ডহর সংকর গ্রামে। এর প্রতিষ্ঠাকাল প্রায় দেড় শত বছর পূর্বে।

নবগ্রাম উদচারা মসজিদ : এ মসজিদটি এ জেলার সবচেয়ে পুরনো। প্রায় ৫০০ বছর পূর্বে সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় মীর মাশায়েক শাহ্ দিল্লী থেকে এ বাংলায় আসেন এবং ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন। তিনি এ মসজিদ প্রতিষ্ঠিত করেন।

সুগন্ধিয়া মসজিদ : এ মসজিদটিও প্রায় ৫০০ বছর পূর্বের। হযরত একিন শাহ্ এ মসজিদ তৈরি করেন। এ মসজিদের দক্ষিণ পাশেই ছিল তার খানকা।

পোনাবালিয়া শিববাড়ি মন্দির : এ এলাকার শিব প্রাসাদের ভ্রাতুষ্পুত্রী (শিব প্রসাদের কন্যা) চাঁদমনি দেবী এ বিখ্যাত শিব মন্দিরটি নির্মাণ করেন। হিন্দু সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক ধর্মীয় স্থান এটি। এর প্রাচীন নাম শ্যামরাইল। একসময় এখানে সপ্তাহব্যাপী মেলা হত, অবিভক্ত বাংলার দর্শনার্থী ছাড়াও শ্রীলংকা, মায়ানমার নেপাল থেকে অনেক পর্যটক ও ভক্তরা এ মেলায় যোগ দিত। এখনও ফাল্গুন মাসে শুক্ল পক্ষের চতুর্দশীতে মেলা বসে, তবে মেলার সময়সীমা ৩ দিনে নেমে এসেছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের নিকট এ পোনাবালিয়া মন্দিরটি তৃতীয় আন্তর্জাতিক পবিত্র স্থান হিসেবে পরিচিত।

মদন মোহন ঠাকুরের আখড়া : এ মন্দিরটি ১২৯০ বঙ্গাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। উড়িষ্যার কুলীণ ব্রাহ্মণ জগবন্ধু পাণ্ডা এখানে প্রথম পূজারীর দায়িত্ব পালন করেন। ভূকৈলাশ দেবোত্তর স্টেটে প্রতিষ্ঠিত এ মদন মোহন ঠাকুরের আখড়া

মন্দির থেকে হিন্দু সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রা ও জন্মাষ্টমীর শোভাযাত্রা বের হত। বর্তমানে এ মন্দিরের পাশে একই স্টেটে গড়ে উঠেছে শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, যার নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে।

এ জেলার কীর্তিপাশা, নলছিটির কাপুরিয়া ও ঝালকাঠী শহরে এক সময় স্থায়ী নাট্যমঞ্চ ছিল। এ সব নাট্যমঞ্চের ধ্বংসাবশেষ এখনও আছে।

চারণ কবি মুকুন্দ দাস - এর জন্ম এ জেলায় বলে কথিত আছে। বিখ্যাত কবি জীবনানন্দ দাসের জন্মও ঝালকাঠীতে, তার মাতুলালয়ে। যদিও তার পিতার বাড়ি ছিল বিক্রমপুর। তার বহু লেখায় ঝালকাঠীর সুগন্ধা, ধানসিঁড়ি নদী ও ঝালকাঠীর প্রাকৃতিক দৃশ্যের কথা বার বার প্রতিফলিত হয়েছে।

সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অফিস-সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (পিডিও-আইসিজেডএমপি) পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)-র একটি প্রকল্প। এটি একটি বহুখাতভিত্তিক এবং বহুপ্রতিষ্ঠানভিত্তিক উদ্যোগ। একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটি এবং একটি টেকনিক্যাল কমিটির নির্দেশনায় এটি পরিচালিত হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে ফেব্রুয়ারি, ২০০২ সালে।

উপকূলীয় উন্নয়নের সার্বিক লক্ষ্য হচ্ছে এমন একটি পরিবেশ তৈরি করা যেখানে টেকসই জীবিকা উন্নয়ন এবং জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে উপকূলীয় এলাকার উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সমন্বয় সাধন করা যায়।

এই প্রকল্পের কর্মকাণ্ডকে ছয়টি কর্মসূচিতে ভাগ করা হয়েছে -

- উপকূল অঞ্চল নীতি প্রণয়ন
- উপকূল অঞ্চলের জন্য কর্মকৌশল প্রণয়ন
- উপকূল অঞ্চলের উন্নয়নে বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়ন
- উপকূল অঞ্চলের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন
- প্রতিষ্ঠান ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা
- একটি সমন্বিত জ্ঞান ভাণ্ডার

বর্তমানে প্রকল্প থেকে বহু বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদনসহ উপকূল অঞ্চল নীতি প্রণীত হয়েছে। উপকূল অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের রূপরেখা প্রণয়নে উপকূলীয় এলাকার গণমানুষের পরামর্শ ও মতামত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর তাই প্রকল্প শুরুর সময় থেকে আজ অবধি সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা ও জেলাবাসীর অংশগ্রহণে অনেকগুলো বৈঠক, গবেষণা ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এরই ধারাক্রমিক বিবরণ নীচে তুলে ধরা হল।

উপকূলীয় জেলার বিপদাপন্নতার কারণ অধ্যয়ন	**জুলাই, ২০০৩**
খসড়া উপকূল অঞ্চল নীতির উপর জেলা পর্যায়ে মতবিনিময় সভা	**অক্টোবর, ২০০৩**

জনসাধারণের সার্বিক অবস্থা জানার লক্ষ্যে পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়ার বিষয়টি এখানেই থেমে নেই। প্রকল্পের পরিকল্পনা অনুযায়ী এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া হিসেবে চলতে থাকবে। খুব শিগগিরই প্রকল্প ও জেলাবাসীর অংশগ্রহণে উপকূলীয় উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণের উপর আলোচনা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হবে।